AN E-E PUBLICATION

# ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস

অরুণ ঘোষ

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স

# ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস



অরুণ ঘোষ এম্‌-এ ( শিক্ষা ও দর্শন )
স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত : বি-এড্‌ ( বিশ্বভারতী )
অধ্যাপক, শিক্ষা ও দর্শন বিভাগ
সিটি কলেজ : দক্ষিণ কলিকাতা



এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স
কেন্দ্র-কার্যালয় : ১৬এ, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্সের পক্ষ
থেকে শম্পা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত



প্রথম সংস্করণ—১৯৬১
দাম : পাঁচ টাকা

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট থেকে
দেবেশ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

# পুরোভাষ

আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে যেমন ইংলণ্ডের রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়তে হয় তেমনই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরই ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকা অপরিহার্য্য। ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে আমরা যে কেবল একটি ঐতিহ্যময় জাতির শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের কাহিনীই পাই তা নয়, আমরা দেখি কেমন করে অজ্ঞ জনসমাজ ধীরে ধীরে নিজেদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে, কেমন করে উদাসীন সরকার দেশের শিক্ষা প্রসারের দায়িত্বগুলি একের পর এক নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে এবং সব শেষে কেমন করে সরকার ও জনসমাজ পরস্পারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ও আদর্শস্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস যে কোন শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্রের কাছে অসংখ্য নতুন জ্ঞানের উৎস, অগণিত চমকপ্রদ তথ্যের আকর।

বিশেষ করে ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেই হবে। কেননা এখনও ভারতে প্রাথমিক থেকে সুরু করে উচ্চতম শিক্ষার যে কাঠামো প্রচলিত আছে, তার সবটুকুই ইংলণ্ডের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিফলিত রূপ। ভারতের বন্দরে ইংরাজদের জাহাজ থেকে কেবলমাত্র গোরা সৈন্য, বন্দুক, বেয়নেট, তৈরী মাল, ফিরিঙ্গি শাসক, বাইবেল, পাদ্রী, ইত্যাদিই নামে নি তার সঙ্গে নেমেছিল ইংরাজদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং তার গর্বিত বাহকগণ। ফলে যখন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করা হল সেটি নিখুঁতভাবে হল ইংলণ্ডে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিছক অনুকরণ। এই কারণেই অ্যাডাম প্রভৃতি বিচক্ষণদের ভারতের ভূমিজ শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিত্তি করে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার আবেদন অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার কাছে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে কতটা ঋণী তার কিছুটা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে আমাদের ক্লাসরুম, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, প্ল্যাটফর্ম, ঘণ্টা, রোল-কল, পিরিয়ড-

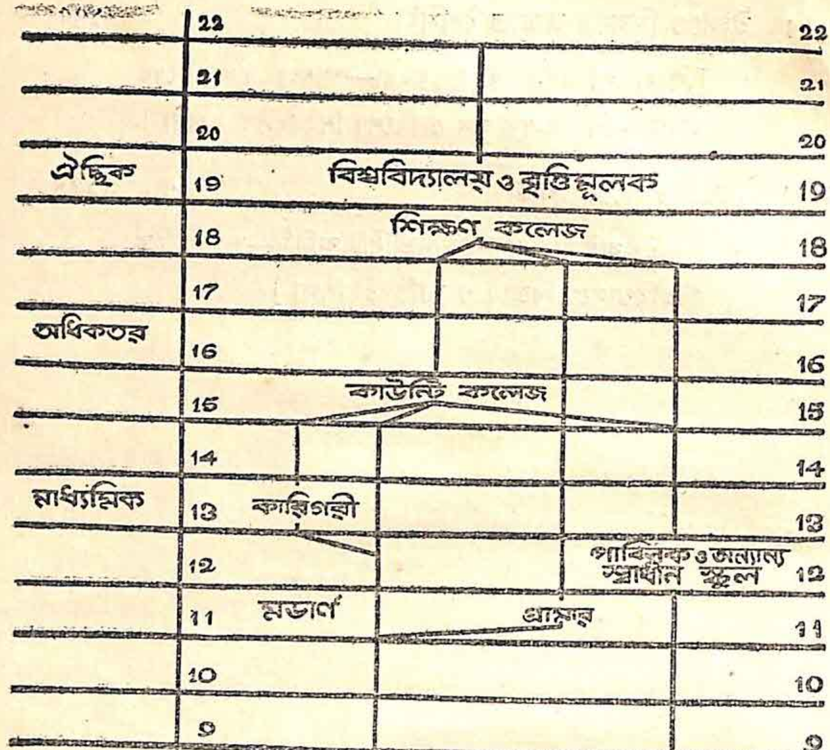
বিভাগ, টাইম-টেবল, রবিবার ছুটি, শনিবার অর্ধেক ছুটি, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, ক্লাস-টিচার, বোর্ডিং প্রথা, প্রিফেক্ট প্রথা, মাসিক বেতনদানের প্রথা, পরীক্ষা-ব্যবস্থা, টিউটোরিয়াল প্রথা, স্কুল পরিদর্শন প্রথা, গ্রাণ্ড-ইন-এড্ প্রথা, ইত্যাদি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অগণিত বৈশিষ্ট্য সরাসরি ইংলণ্ড থেকে আমদানি।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার নিছক অনুকরণ হলেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা তুলনায় অনেক অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ। ইংরাজদের আমলে এর কারণ ছিল শাসকদের ওষ্ঠ-গভীর আন্তরিকতা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতার একান্ত অভাব। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও শিক্ষাব্যবস্থার যথাপূর্ব অবস্থা থাকার কারণ হল যে ভারতের বর্তমান কর্ণধারেরা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। আধুনিক নীতি-সংঘর্ষময়, যুদ্ধবিদ্ধস্ত এবং নির্মম-রাজনীতির যুগে কোন জাতিকে বেঁচে থাকতে হলে প্রথম প্রয়োজন জনগণের মধ্যে সংহতি এবং সে সংহতি শুষ্ক বক্তৃতা-উপদেশ থেকে আসে না, আসে সর্বজনীন শিক্ষা থেকে। ইংলণ্ড এ সত্য বহুদিন আগেই উপলব্ধি করেছিল এবং সেইজন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলার মধ্যেই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন পাশ করে সর্বসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতা-লাভের পর ১৪ বৎসর পূর্ণ হতে চলল অথচ ভারতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও হয় নি, মাধ্যমিক শিক্ষার কথা দূরে থাক। মনে হয় যতদিন অতি-নির্মম কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার মত দুর্দিন ভারতের জীবনে না আসছে ততদিন ভারত এই সহজ সত্যটুকু উপলব্ধি করবে না।

১৬এ ফার্ন রোড, কলি-১৯<br>
২০শে জুলাই, ১৯১৬

**অরুণ ঘোষ**

## সূচীপত্র




[ ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের মধ্যে যোগাযোগের বর্ণনামূলক চিত্র ]

## ১। একটি সামগ্রিক ছবি

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৪৪ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই বিভাগ অবশ্য নিছক আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য এবং দুটি অংশের মধ্যে হঠাৎ কোন বিরাট ছেদ ঘটেছে বা কোনরূপ যোগসূত্র নেই একথা ভাবা ভুল হবে।

তবে প্রায় একশ বছর ধরে ইংলণ্ডের বিচ্ছিন্ন ও অসংহত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত ও সর্বজনীন রূপ দেবার যে প্রচেষ্টা ইংলণ্ডের সরকার ও জনগণের মধ্যে কাজ করে এসেছিল তার পূর্ণাংগ পরিণতি ঘটে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে। এই শিক্ষা আইনই শিক্ষার বিস্তার ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন বলে স্বীকার ক'রে নেয় এবং ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করে। বর্তমান ইংলণ্ডে শিক্ষার যে সংগঠনটি প্রচলিত আছে তার জন্মদাতা হল এই আইনটি।

পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন অন্যান্য জাতির শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগোয়, ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাও সেইভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অধিবাসীদের কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহু বৎসর ধরে এগিয়েছে মন্থর ও সতর্ক পদক্ষেপে। সরকারের সাহায্য দূরে থাক কোনরূপ সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থাও উনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠেনি। সরকারের প্রথম সাহায্য এল ১৮৩৩ সালে। যে যে কারণগুলি ইংলণ্ডের শিক্ষার অগ্রগতির পথে বিঘ্নরূপে কাজ করেছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হল ইংলণ্ডবাসীদের রক্ষণশীলতা। ইংলণ্ডবাসীদের ঐতিহ্য ও প্রাচীন প্রথাপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ অসীম। হঠাৎ কোন নতুন পরিবর্তনকে তারা অসন্দিগ্ধ মনে গ্রহণ করতে চায় না। যা প্রাচীন এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতিসিক্ত সেগুলিকে তারা সহজে বদলাতে রাজী হয় না। সেইজন্য বহুদিন ধরে প্রচলিত শিক্ষার প্রচলিত আয়োজনে সহজে কোন পরিবর্তনকে তারা প্রবেশ করতে দেয়নি। দ্বিতীয় কারণ হল ইংলণ্ডবাসীদের অসীম স্বাধীনতাপ্রীতি। নিজেদের ব্যক্তিগত

ব্যাপারের উপর কারও হস্তক্ষেপকে চিরকালই তারা ভয় পায় এবং সেইজন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সব সময়েই তারা সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। তৃতীয়ত, নানা রাজনৈতিক কারণে সরকারের কর্মক্ষমতার উপর তাদের আস্থা খুব বেশী ছিল না। রাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থায় সরকারের মনোভাব সব সময়ই জনস্বার্থবিরোধী ছিল। ফলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ত দূরে থাকুক কোনরূপ হস্তক্ষেপও উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত সহ্য করা হয়নি। এই সকল কারণের জন্যই ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন ছিল ধীর ও মন্থর।

অথচ ইংলিশ-চ্যানেলের ওপারে ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিক্ষার অগ্রগতি ঐ একই সময়ে ছিল দ্রুত ও বৈচিত্র্যময়। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নানারকম নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সমস্ত দেশময় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেতে চলেছিল।

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রথম সুরু হয় ১৮৩৩ সালে, যখন বাৎসরিক ২০০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হল দেশের শিক্ষার বিস্তারের জন্য। সেই থেকে ধীরে ধীরে শিক্ষা সম্বন্ধে একটা সর্বজনীন সচেতনতা দেখা দিতে সুরু করল। একের পর এক আইন পাশ হতে লাগল দেশের বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল রূপ দিতে। ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বলে দুটি পৃথক শিক্ষাস্তর ছিল না। প্রাথমিক স্কুলেও মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হত আবার মাধ্যমিক স্কুলের সংগেও প্রাথমিক শিক্ষা সংযুক্ত ছিল। পাঠক্রমও দেশের সময়োচিত প্রয়োজনের অনুরূপ ছিল না। গ্রামার স্কুল নামক স্কুলগুলিতে কেবল ল্যাটিন রোমান হিব্রু ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা পড়ানো হত। প্রাইভেট স্কুলগুলিতে গণিত, আধুনিক ভাষা ইত্যাদি দরকারী বিষয় কিছু কিছু পড়ানো হলেও তেমন সন্তোষজনক ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষণ প্রথাও ছিল অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর; স্কুলের আবহাওয়া ছিল শোচনীয়। কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার জন্যও কোনরূপ উপযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাও একই রকমের বিপর্যস্ত ছিল। অতএব যেমন প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় সাহায্যের তেমনি প্রয়োজন ছিল শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের। এর ফলে প্রথম শিক্ষার আইন পাশ হল ১৮৭০ সালে। এই আইনের বলে সরকার যে-সকল স্থানে ছেলেমেয়েদের পড়ার স্কুল নেই সে-সকল স্থানে স্কুলবোর্ড গড়লেন এবং তাদের হাতে ভার দিলেন স্কুল তৈরী করার। এর ফলে দেশে স্কুলের অভাব

দূর হল। সব অঞ্চলেরই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা হল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার তেমন একটা সুসংহত রূপ এর দ্বারা সৃষ্ট হল না। পাঠক্রম, শিক্ষা-পদ্ধতি ইত্যাদি তেমনই অনগ্রসর রইল। তাছাড়া প্রাইভেট স্কুলগুলি যেমন স্বাধীন ছিল তেমনই রইল। তাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হল না।

এর পরের শিক্ষা-আইন পাশ হল ১৯০২ সালে। এই আইনের দ্বারা ইতস্তত স্থাপিত ও অপরিকল্পিত স্কুলবোর্ডগুলিকে তুলে দিয়ে ইংলণ্ডের মিউনিসিপাল অঞ্চল অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা হল। এর ফলে কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টিবারো কাউন্সিল দেখা দিল স্কুল-বোর্ডের জায়গায় এবং সেগুলিই স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ( Local Education Authorities ) বা সংক্ষেপে এল-ই-এ ( L.E.A. ) বলে পরিচিত হল। এই আইনের বলে সরকারী বেসরকারী সমস্ত স্কুলই এল-ই-এ'র কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল। ১৯০২-র আইনে নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট সংস্কার করা হলেও প্রচলিত পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

১৯১৮ সালে ইংলণ্ডে আর একটি শিক্ষা-আইন পাশ হল। এই আইনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হল। ১৯২৬ সালে হ্যাডো রিপোর্ট্ নামে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হয়। এতে মাধ্যমিক শিক্ষার নানারূপ সংস্কার সাধনের প্রস্তাব থাকে।

১৯৩৬ সালে আর একটি শিক্ষা-আইন পাশ হয়। এই আইনে তেমন বিশেষ কোন সংস্কার সাধন করা হয় না। কেবল স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষরা যাতে বেসরকারী স্কুলগুলিকে অধিক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে তার জন্য ক্ষমতা এই আইনের দ্বারা দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালে স্পেন্স্ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করে বিভিন্নধর্মী মাধ্যমিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হয় এই রিপোর্টে। এর পরের শিক্ষা-আইনটি পাশ হয় ১৯৪৪ সালে। এই আইনটি ইংলণ্ডের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এতদিন যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে ব্যর্থ করে আসছিল সে সবকে দূর করে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার একটা

সুসংহত ও সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই আইনটিতে। এই আইনের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলো হল এই: শিক্ষাবোর্ড তুলে দিয়ে দেশের শিক্ষার বিস্তার ও তত্বাবধানের জন্য একটি মন্ত্রীদপ্তর খোলা হল। ইংলণ্ডে এই প্রথম সৃষ্ট হল শিক্ষার মন্ত্রীদপ্তর ( Ministry of Education )।

ব্যবস্থা হল যে, শিক্ষামন্ত্রী দুটি মন্ত্রণা-পরিষদ ( Advisory Council ) এবং একজন সেক্রেটারী ও অন্যান্য অধীনস্থ কর্মচারীর সহায়তায় দেশের শিক্ষার সুষ্ঠু প্রসার ও সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করে যাবেন। শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারা নির্বাচিত পরিদর্শক গোষ্ঠীরা তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করবেন।

এই গেল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ হলেন কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিল। এদের সংক্ষেপে নাম দেওয়া হল লোকাল এডুকেশান অথরিটি বা এল-ই-এ ( L. E. A. )। শিক্ষাঘটিত স্থানীয় কাজ কর্ম যা-কিছু তার ভার রইল এল-ই-এ'র হাতেই। নিয়ম হল প্রত্যেকটি এল-ই-এ'ই একটি করে শিক্ষা-কমিটি গঠন করবেন এবং সমস্ত শিক্ষামূলক কাজ করার সময় তাদের সংগে পরামর্শ করবেন। প্রত্যেক এল-ই-এ উপযুক্ত লোক দেখে একজন করে প্রধান শিক্ষা-কর্মচারী নিযুক্ত করবেন।

এই আইনেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ শিক্ষাকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করা হল, যেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর (Further)। প্রত্যেক স্তরের জন্য বয়সের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক করা হল, যেমন প্রাথমিক ৬ থেকে ১২র অনধিক। মাধ্যমিক ১২ থেকে ১৬ এবং অধিকতর ১৬র উপরে। এল-ই-এ'র তৈরী স্কুলগুলির নতুন নামকরণ হ'ল, কাউন্টি স্কুল এবং যেগুলি এল-ই-এ'র তৈরী নয় সেগুলির নাম দেওয়া হল ভলাণ্টারী স্কুল। ভলাণ্টারী স্কুলগুলি অর্থাৎ যে স্কুলগুলি কোন ধর্মমূলক বা জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দ্বারা তৈরী, সেগুলি আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হল, সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided), বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন (Special arrangement) এবং নিয়ন্ত্রিত ( Controlled )। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে শিক্ষামন্ত্রীদপ্তর স্কুলবাড়ী পরিবর্তন বা সংস্কার সাধন বাবদ ব্যয়ের অর্ধেক সাহায্য করতে পারেন। বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন স্কুলগুলির স্কুলভবনের পরিবর্তনের জন্য যা টাকা লাগবে তার তিন চতুর্থাংশ দেবে এল-ই-এ। নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলির

পরিচালনের ব্যয়ও বহন করবে এল-ই-এ। কাউন্টিস্কুলগুলি হল সম্পূর্ণ এল-ই-এ'র কর্তৃত্বাধীন স্কুল এবং সেগুলির সমস্ত ব্যয় বহন করার দায়িত্বও এল-ই-এ'র। এল-ই-এ'র পরিচালিত কোন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কোন বেতন নেওয়া হবে না। এই আইনেই ইংলণ্ডে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হল। ৫ বছর বয়সে পা দেওয়া থেকে সুরু করে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হল। উপযুক্ত সময় এলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সীমারেখাটি ১৫ বৎসর বয়সকে বাড়িয়ে ১৬ বৎসর করারও অধিকার দেওয়া হ'ল শিক্ষাদপ্তরকে। অধিকতর শিক্ষা ( Further Education ) বলতে বোঝায় বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণের বয়স পার হয়ে যাবার পর কিছু সময়ের জন্য বা পুরো সময়ের জন্য কোনরূপ শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা। তাছাড়া কর্ম-নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবসর যাপনের আয়োজনও এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে অধিকতর শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। উন্নত কারিগরী বা শিল্পমূলক শিক্ষা থেকে সুরু করে সাধারণ ক্লাব বা সাংস্কৃতিক সংস্থার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাও এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। এই অধিকতর শিক্ষা-ব্যবস্থার অংগরূপেই কাউণ্টি কলেজ স্থাপিত করার পরিকল্পনাটিও এই আইনে অন্তর্গত করা হয়েছে, যদিও সেটিকে এখনও বাস্তবে রূপায়িত করা হয়নি।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৪ সালের আইনটি প্রচলিত শিক্ষাধারার একরকম আমূল সংস্কার সাধন করেছে। ইতিপূর্বের আইনগুলি শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু কিছু দূর করলেও তাদের রক্ষণশীলতা ও অনিশ্চয়তার ফলে একটি সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৪৪ সালের আইনটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এর নীতিগত দৃঢ়তা ও সুনিশ্চয়তা। এই আইনের ফলে ইংলণ্ডে আজ একটা দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

১৯৪৪ সালের আইনটি কার্যকরী করতে গিয়ে কিছু কিছু অসুবিধা অনুভূত হয়েছিল এবং সেগুলি দূর করার জন্য ১৯৪৬ সালে, ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫৩ সালে আরও তিনটি আইন পাশ করা হ'ল। অবশ্য এই আইনগুলির দ্বারা ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার যে মূল কাঠামোটি নির্ধারিত হয়েছিল তার বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

## ২। প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা নিতান্তই দৈন্যময় ছিল। তবে একেবারে জনসাধারণের শিক্ষাগ্রহণের কোন মাধ্যম ছিলনা একথা ভাবলে ভুল হবে। বহু জনকল্যাণকামী ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণের জন্য ছোট ছোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরুতে শিক্ষা সম্বন্ধে একটা ব্যাপক সচেতনতা দেখা যায় এবং কতকগুলি জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান ঐ সময় গঠিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের জনগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করে। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটে। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় খ্রীষ্টধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সমিতির (Society for Promoting Christian Knowledge)।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা যায় ইংলণ্ডে বহু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রচলিত রয়েছে। এগুলি সরকারের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য পেত না বা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও হত না। প্রধানত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ধর্মযাজকগণেরই তত্ত্বাবধানে এই স্কুলগুলি পরিচালিত হত।

**ডেম্ স্কুল ঃ**

প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একশ্রেণীর স্কুলের নাম ছিল ডেম স্কুল (Dame school)। ডেম কথাটির অর্থ মহিলা। সাধারণত একজন করে বয়স্কা মহিলা এই স্কুলগুলি পরিচালনা করতেন বলে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এই ডেম স্কুলগুলিকে শিশুবিদ্যালয় (Infant school) বলে বর্ণনা করা যায়। এই সব ডেম স্কুলের সাপ্তাহিক বেতন সামান্য কয়েক পেন্স্ মাত্র ছিল। বিভিন্ন ইংরাজী সাহিত্যিকের লেখায় এই ডেম স্কুলের নানারূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

**কমন-ডে স্কুল বা প্রাইভেট স্কুল ঃ**

আর এক ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম ছিল কমন-ডে স্কুল বা

প্রাইভেট ডে স্কুল ( Common Day School or Private Day School ) এগুলিতে একটু বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে যেত। এগুলিকে জুনিয়ার ( Junior ) স্কুল বলা যেতে পারে। এগুলিতেও একজন করে শিক্ষক থাকতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পুরুষই হতেন। এই শিক্ষকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অজ্ঞ এবং নিষ্ঠুর হতেন। তবে কোন কোন কমন-ডে স্কুলেতে যে ভাল শিক্ষা দেওয়া হত না তা নয়।

**চ্যারিটি স্কুল ঃ**

ডেম স্কুল এবং কমন-ডে স্কুল উভয় ধরনের বিদ্যালয়েই নিতান্ত প্রাথমিক ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত এবং উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত। কিন্তু যারা নিতান্ত গরীব তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য স্বতন্ত্র এক ধরনের বিদ্যালয় সৃষ্ট হয়েছিল। দরিদ্র জনগণকে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা প্রথম প্রথম নিছক ধর্মমূলক বা উদারতার পরিচায়ক বলে মনে করা হত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর সাধারণ জনগণকে শিক্ষা দেওয়াটা রাজনৈতিক কারণেও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হল। ইংলণ্ডের শাসকগণ ক্রমশ বুঝলেন যে জনসাধারণের মধ্যে অন্যায়, অধর্ম এবং অনিষ্টকর প্রবণতা দূর করতে হ'লে তাদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। এই ধরনের মনোভাব থেকে চ্যারিটী স্কুল ( Charity school ) নামে এক নতুন ধরনের স্কুলের উদ্ভব হল। 'খ্রীষ্টধর্মীয় জ্ঞান প্রচারের জন্য সমিতি' কর্তৃক বহু পূর্বেই এই ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্যারিসের ( Parish )† সংগে এধরনের স্কুলগুলি সংশ্লিষ্ট থাকত এবং ছেলেমেয়েরা দিনের বেলায় স্কুলে যোগদান করত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বোর্ডার বা আবাসিক শিক্ষার্থী রাখা হত। গির্জার পাদ্রীই ছেলেমেয়েদের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদেরও যাজক সম্প্রদায় থেকে নেওয়া হত। কোন কোন চ্যারিটী স্কুলের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল এবং শিক্ষকরা তাদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী বেতনও পেতেন না। কোন কোন স্কুলে অবশ্য শিক্ষকদের জন্য সুব্যবস্থাও ছিল।

† শাসনের সুবিধার জন্য ইংলণ্ডের দেশগুলিকে কাউন্টিতে ( County ) ভাগ করা হয় এবং কাউন্টিগুলিকে আবার কতকগুলি প্যারিসে ( Parish ) ভাগ করা হয়। সাধারণত একটি নিজস্ব গির্জাকে ঘিরে একটি প্যারিস গঠিত হয়ে থাকে।

চ্যারিটী স্কুলগুলির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মীয় উপদেশ এবং পঠন। কোন কোন ক্ষেত্রে লিখন এবং গণিতও এর সংগে যুক্ত থাকত। কিন্তু ধর্ম-শিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হোত। শিল্পঘটিত বৃত্তিগুলি যেমন, সুতো কাটা, সেলাই করা, বোনা, বাগান করা, এমন কি লাংগল চষা ইত্যাদিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কুল থেকে বেরিয়ে যাতে শিক্ষার্থী কোন একটি বিশেষ কাজে ঢুকতে এবং নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কোন একটি শিল্পে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনরূপ বেতন নেওয়া হত না এবং ব্যক্তিগত দান, জনসাধারণের অর্থসাহায্য ইত্যাদির সাহায্যেই এই চ্যারিটী স্কুলগুলি চলত। চ্যারিটী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তাদের জন্য গির্জায় বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হত এবং প্রকাশ্যে সাহায্য সংগ্রহ করা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চ্যারিটী স্কুলগুলি ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করেছিল। যেমন, ১৭৬০ সালে প্রায় ত্রিশ হাজার ছেলেমেয়ে এই ধরনের চ্যারিটী স্কুলে শিক্ষালাভ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই স্কুলগুলির কার্যকারিতা কমে আসতে লাগল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে চ্যারিটী স্কুলের পদ্ধতিকে সকলে যান্ত্রিক এবং বিশৃঙ্খল বলে সমালোচনা করতে লাগলেন। চ্যারিটী স্কুলে পড়ানোর নিয়মকানুন নিয়ে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করতে সুরু করলেন।

পরে এই চ্যারিটী স্কুল থেকেই আরেক ধরনের স্কুলের সৃষ্টি হল। সেই স্কুলগুলির নাম মনিটোরিয়াল স্কুল ( Monitorial School ) বা সর্দার পড়ুয়া স্কুল। এগুলির সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

**শিল্পমূলক স্কুল ঃ**

তৃতীয় এক শ্রেণীর স্কুলের নাম স্কুল অব্ ইন্ডাষ্ট্রি (School of Industry) বা শিল্পমূলক স্কুল। এগুলিও অত্যন্ত দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরী হয়েছিল এবং এগুলিতে কোনরূপ বেতন নেওয়া হত না। এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে শিল্পমূলক বিপ্লবের (Industrial Revolution) আগে শ্রমিকদের জন্য এই ধরনের স্কুল সৃষ্ট হয়নি। এই স্কুলগুলিতে সুতো কাটা, বোনা, সেলাই

করা, জুতো সেলাই করা ইত্যাদি শেখানো হত। ছেলেমেয়েদের তৈরী জিনিষ বাজারে বিক্রী করে সেই অর্থে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত টাকা শ্রমের মূল্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হত। ধর্মমূলক শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে মনে করা হত, তাই স্কুলগুলিতে ধর্মমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনরূপ জ্ঞানমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

**সানডে স্কুল ঃ**

আরেক শ্রেণীর প্রাথমিক স্কুলের নাম ছিল রবিবারের স্কুল বা সান-ডে স্কুল (Sunday School)। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফ্যাক্টরীতে কাজ করত এবং এই ধরনের শিশু শ্রমিকদের বেশ চাহিদা ছিল। ফলে শিল্পমূলক বিদ্যালয়গুলিতে (School of Industries) যোগদান করতে অনেক ছেলেমেয়েদেরই অসুবিধা হ'ত। পিতামাতারাও অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে অর্থ উপার্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সমস্ত ফ্যাক্টরিই রবিবারে বন্ধ থাকত। ফলে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের রবিবারে শিক্ষাদানের জন্য একটা আন্দোলন দেখা দিল। রবার্ট রেকস্ (Robert Raikes) নামে এক ব্যক্তি প্রথম গ্লষ্টারে অশিক্ষিত শ্রমিক ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুললেন। ক্রমশ এই প্রথাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং ১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডের বিভিন্ন কাউন্টিতে সান-ডে (Sunday) স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সমিতি গঠিত হ'ল। সান-ডে স্কুলগুলির মোটামুটী লক্ষ্য ছিল ছেলেমেয়েদের ধর্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক শিক্ষা দেওয়া—জ্ঞানমূলক শিক্ষা দেওয়া নয়। লিখন বা গণিতের শিক্ষা সান-ডে স্কুলে দেওয়া হত না। এই স্কুলগুলিতে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করার জন্য বহু শিক্ষক স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন এবং বহু উদারচেতা নাগরিক নানাদিক দিয়ে এগুলিকে সাহায্য করলেন।

সান-ডে স্কুলগুলির ছাত্রের সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে চলল। ১৭৮৭ সালে গ্রেটব্রিটেনে প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্র সান-ডে স্কুলে পড়ত। ১৮০১ সালে দেখা গেল কেবল লণ্ডনেই দেড় লক্ষের বেশী ছেলেমেয়ে সান-ডে স্কুলে পড়ে। সান-ডে স্কুলে যোগ দেওয়ায় ফ্যাক্টরীর কাজের কোনও ক্ষতি হত না বলে শিল্পপতিরাও সান-ডে স্কুলে যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। এক দিক দিয়ে

দেখতে গেলে ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে সান-ডে স্কুলের অবদান প্রচুর। অনেকে এই স্কুলগুলিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের শিক্ষার সূত্রপাত বলে বর্ণনা করেন। তাছাড়া শিল্পবিপ্লবের পর যে সব ছেলেমেয়েরা দলে দলে ফ্যাক্টরীতে যোগদান করেছিল তাদের শিক্ষা দেবার একমাত্র মাধ্যম ছিল এই সান-ডে স্কুলগুলি। এই সান-ডে স্কুলেতে মালিক, ফোরম্যান, মজুর সকলে এক জায়গায় মিলবার সুযোগ পেত এবং পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল তার কিছুটা এখানে দূর হবার সুযোগ ঘটেছিল। কেবল তাই নয় ইংলণ্ডে পরে যে সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তারও প্রাথমিক ধারণা জন্ম নিয়েছিল সান ডে স্কুল থেকে।

**সার্কুলেটিং স্কুল ঃ**

গ্রেটব্রিটেনের ওয়েলস্ নামক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য এক বিশেষ ধরনের স্কুল তৈরী করা হয়েছিল। এগুলির নাম সার্কুলেটিং স্কুল (Circulating School)। গ্রিফিথ্ জন নামক একজন ধর্মযাজক দেখলেন যে ওয়েলসের বিদ্যালয়গুলি ওয়েলস্‌বাসীদের পক্ষে সংখ্যায় নিতান্তই অপর্যাপ্ত ছিল। সেই জন্য তিনি দরিদ্রদের জন্য কতকগুলি স্কুল স্থাপিত করলেন। এই স্কুলের শিক্ষকরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং এক একটি জায়গায় তিন বা ছ'মাস থেকে সেখানে শিক্ষা দিয়ে অপর একটি জায়গায় চলে যেতেন। যেখানে তাঁরা যেতেন সেখানে একটি খালি বাড়ী খুঁজে নিতেন এবং সেখানে শিক্ষা দিতেন। সাধারণত মাতৃভাষায় বাইবেল পড়ানো এবং অন্যান্য ধর্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বাদি শেখানো এই শিক্ষকদের কাজ ছিল। ছোট ছেলে মেয়ে থেকে সুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিরাও এই স্কুলে যোগদান করতে পারত। যদিও এই স্কুলগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তবুও গ্রিফিথ জনে'র মৃত্যুর পর এগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগল।

**মনিটোরিয়াল স্কুল বা সর্দার পড়ুয়া স্কুল ঃ**

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ইংলণ্ডের শাসক ও নেতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার আগ্রহ আরও প্রবল হ'য়ে দেখা দিল। দরিদ্র জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে তাদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করা হচ্ছে তা যে কেবল মানবতার দিক দিয়েই নিন্দনীয় তা নয়,

দেশের নিরাপত্তার দিক দিয়ে বিপজ্জনক, এ সত্যটুকু সকলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন। অথচ অল্পব্যয়ে কি ক'রে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

এই সমস্যার সমাধানরূপে দেখা দিল মনিটোরিয়াল ( Monitorial ) বা সর্দার-পড়ুয়া-শিক্ষণপ্রথা। এই প্রথায় ছেলেমেয়েরাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। পদ্ধতি হিসাবে এই প্রথা বহুদিনের পুরাতন এবং সব দেশেই কমবেশী অনুসৃত হ'য়ে এসেছে। ইংলণ্ডে এই পদ্ধতির প্রচারকরূপে দুজনের নাম করা যায়ঃ এ্যান্ড্রু বেল ( Andrew Bell ) এবং জোসেফ ল্যাংকাষ্টার ( Joseph Lancaster )

ইতিপূর্বে বেল মাদ্রাজে মিশনারী হ'য়ে বহুদিন ছিলেন এবং সেই সময় দেশীয় ছেলেমেয়েদের একটি স্কুলের ভার ছিল তাঁর হাতে। তখন তিনি এই মনিটার প্রথা বা সর্দার-পড়ুয়া'র প্রথা তাঁর সেই স্কুলে প্রচলিত করেন। বলা বাহুল্য তিনি ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি থেকেই এই প্রথাটি গ্রহণ করেন। ভারতের টোল পাঠশালাগুলিতে সর্দার পোড়ো'র দ্বারা পড়ানোর প্রথা বহুদিন ধরে চলে এসেছে। বেল ইংলণ্ডে ফিরে এই প্রথার প্রবর্তন করলেন। এই সময়েই জোসেফ ল্যাংকাষ্টার নামে আর একজন শিক্ষক এই ধরনের আর একটি বিদ্যালয় খুললেন। এই স্কুলগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের দিয়ে নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত। শিক্ষক মনিটারদের শেখাতেন এবং তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। মনিটাররা বাকী ছেলে-মেয়েদের শেখাত। ফলে একজন প্রধান শিক্ষকের অধীনে অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা করতে পারত। এই ধরনের মনিটার চালিত স্কুলগুলিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য সুবিভক্ত। ছেলেমেয়েরা যা শুনত তাই মুখস্থ করে যেত, কোন প্রশ্ন বা আলোচনা করার অবকাশ পেত না। শিক্ষাপদ্ধতি পুরোপুরি যান্ত্রিক ছিল। তবে ছেলে-মেয়েরা কিছুটা শিক্ষা যে পেত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া তারা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শিখত এবং সবচেয়ে বড়কথা হল যে এই শিক্ষণ ব্যবস্থাটি ছিল স্বল্পব্যয়সম্পন্ন।

ল্যাংকাষ্টার ও বেলের পদ্ধতি দুটি যদিও প্রায় অভিন্ন ছিল তবু একদিক দিয়ে তাদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য ছিল। ল্যাংকাষ্টার ছিলেন

প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মী এবং তাঁর স্কুলগুলিতে বাইবেল পড়ানো হলেও কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের কোন শিক্ষা দেওয়া হত না। বেল ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং তাঁর স্কুলগুলিতে ক্যাথলিক মতবাদ প্রচার করা হত। ফলে এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে দুটি বিরোধী দল গড়ে উঠেছিল এবং অচিরে দুটি বিভিন্ন সমিতির সৃষ্টি হ'ল যথা: দরিদ্রদের শিক্ষা প্রসারের জন্য জাতীয় সমিতি (National Association for the spreading of education for the Poor) এবং রাজকীয় ল্যাংকাষ্টারিয়ান সমিতি, পরে নাম বদলে হল ব্রিটিশ এবং বিদেশী স্কুল সমিতি (British and Foreign School Association)।

ইংলণ্ডে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের এই দুটি সমিতির অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের মূলে ছিল এই সমিতি দুটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ১৮২০ সালে একটা হিসাবে দেখা যায় যে প্রায় ৭ লক্ষের উপর ছেলেমেয়ে এই সমিতি দুটির পরিচালিত স্কুলে পড়ে। ১৮২৫ সালে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিস্তারের জন্য সমিতি (Society for the Diffusion of Useful Knowledge) গঠিত হয়।

**প্রথম সরকারী সাহায্য:**

১৮৩৩ সালে গভর্ণমেণ্ট ২০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করলেন স্কুলের বাড়ী তৈরীর জন্য। এই হল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম সরকারী সাহায্য। ১৮৩৩ সাল থেকে প্রতি বছরই এই সাহায্য দেওয়া হয়ে আসছে এবং প্রতি বছরেই এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম প্রথম সরকার ছিলেন একেবারে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন এবং এ ব্যাপারে সরকারের কোনও দায়িত্ব বা কর্তব্য থাকতে পারে তাও মনে করতেন না। কিন্তু ১৮৩৩ সাল থেকে ক্রমশ সরকারের মনোভাব বদলাতে সুরু করল। দেশের শিক্ষিত জনসমাজও অগ্রণী হলেন এবং রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি শিক্ষাব্যবস্থা যাতে গ'ড়ে ওঠে সেজন্য ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল। ১৮৩৬ সালে শিক্ষার কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Society of Education) গঠিত হল শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য। কিন্তু শিক্ষার দায়িত্ব ধর্মযাজকদের হাতে থাকবে, না, ধর্মনিরপেক্ষ কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে তাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। এ দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য ১৮৫৯

সালে তৈরী হল প্রিভিকাউন্সিলের একটি কমিটি। এর কাজ হল জনশিক্ষার সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং সরকার-বরাদ্দ টাকার বণ্টনের তদারক করা। ১৮৩৯ সালে শিক্ষার খাতে সরকারী বরাদ্দ হল ৩০,০০০ পাউণ্ড।

ডক্টর কে নামে একজন শিক্ষাবিদ্ এই কমিটির প্রথম সেক্রেটারী হন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে মনিটোরিয়াল বা ছাত্র-শিক্ষক পদ্ধতি মোটেই নির্ভরযোগ্য বা কার্যকরী পদ্ধতি নয়। সত্যকার জনশিক্ষার প্রসার করতে হলে প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের। সরকারী পরিচালিত শিক্ষক-শিক্ষণের ( Teachers' Training ) কলেজের প্রস্তাব ইতিপূর্বে বানচাল হয়ে যায়। ডক্টর কে তাঁর এক বন্ধুর সহযোগে ব্যাটেরসা নর্মাল স্কুল ( Battersa Normal School ) স্থাপিত করলেন। শীঘ্রই এই শিক্ষক-শিক্ষণের স্কুলটি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠল এবং এর অনুসরণে আরও নর্মাল স্কুল স্থাপিত হ'ল। ১৮৪৫ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে কম করে ২২টি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ তৈরী হয়েছিল।

বেল-ল্যাংকাষ্টারের আমল থেকেই জনশিক্ষার ব্যাপারে ধর্মমূলক শিক্ষা-দান একটা বড় সমস্যা বলে বিবেচিত হয়ে এসেছিল। একদল গোঁড়া ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মনে করতেন যে জনশিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে দেশের ধর্মায়তনের হাতে থাকবে। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি উদার প্রকৃতির ব্যক্তিরা শিক্ষাকে চার্চের হাতে রাখার বিরোধী ছিলেন। এই ধর্মসম্পর্কীয় সমস্যা জনশিক্ষার দ্রুত প্রসারের পথে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। যতদিন সরকার প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি ততদিন শিক্ষার এই সমস্যাটির কোনরূপ সমাধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাতে এই সমস্যা ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগল।

দেশের চিন্তাবিদ্ ও নেতাগণ এখন এই মত পোষণ করতে সুরু করলেন যে দেশের জনগণকে ধর্মশিক্ষা দেবার দায়িত্ব চার্চের হলেও শিক্ষার যে অংশটুকু ধর্মসম্পর্কবিবর্জিত তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের নেওয়া উচিত। তা ছাড়া জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং উদারচিত্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা ও প্রচেষ্টার উপর জনশিক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া মোটেই যুক্তিসংগত নয়। গতানুগতিক পাঠক্রমের সংস্কার করা এবং তার মধ্যে গণিত, অঙ্কন, ভূগোল, ইতিহাস এবং সংগীত অন্তর্ভুক্ত করাও যে বিশেষ প্রয়োজন এ সম্বন্ধেও অনেকে

মত ব্যক্ত করলেন। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে চারটি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হয় কিন্তু চারটি বিলই প্রত্যাখ্যাত হয়।

**নিউক্যাস্‌ল কমিশন :**

জাতীয় শিক্ষার জটিল সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৮৫৮ সালে ডিউক অফ নিউক্যাস্‌লের নেতৃত্বে একটি রাজকীয় পরিদর্শকমণ্ডলী ( Royal Commission ) নিযুক্ত হয়। নিউক্যাসল কমিশন ( Newcastle Commission ) নামে পরিচিত এই কমিশনটি ১৮৬১ সালে নির্ভরযোগ্য ও স্বল্পব্যয় সম্পন্ন শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে সুপারিশ করেন। তা ছাড়া কমিশন দেখিয়ে দেন যে সরকারী অর্থ সাহায্য সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিক্ষণের মান খুব নীচু, পাঠক্রম অসম্পূর্ণ ও অবিজ্ঞানোচিত। বহু ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যোগদানের সময়ের পরিমাণও খুবই কম। ১৮৫৮ সালে শতকরা ৩৮·৮১ ছাত্রছাত্রী মোট ১ বৎসরেরও কম সময় স্কুলে যোগ দিয়েছিল। এই অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য ১৮৬২ সালে শিক্ষার নিয়মকানুনগুলি সংস্কার করা হয় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের সময় ও পরীক্ষার ফলের উপর অর্থ সাহায্য দেবার প্রথা প্রচলিত হল। ফলাফলের উপর অর্থ সাহায্য ( Payment by Result ) দেবার প্রথা ইংলণ্ডে বহুদিন প্রচলিত ছিল এবং সেখান থেকে ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রথাটির আমদানী করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের নতুন স্কুল কোডের সময় এই প্রথাটি বিলুপ্ত করা হয়।

স্কুলের নিয়মকানুনের সংস্কার সাধন করা হলেও জনশিক্ষার সমস্যার যে কোনরূপ সমাধান হল না, এটা সকলেই উপলব্ধি করলেন। ১৮৬৮ সালে লিবারেল পার্টি মন্ত্রীত্ব গঠন করে এবং ডাবলিউ. ই. ফর্স্টার নামে এক প্রগতিমনা ব্যক্তি শিক্ষাবিভাগটির ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭০ সালে শিক্ষার উপর একটি বিল উপস্থাপিত করেন। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সহায়তায় বিলটি পাশ হয় এবং ১৮৭০ সালের শিক্ষা-আইন ( Act of 1870 ) প্রবর্তিত হয়। ইংলণ্ডে এইটি হল প্রথম শিক্ষাঘটিত আইন।

**১৮৭০ সালের শিক্ষা আইন ঃ**

এই আইন অনুযায়ী সমগ্র দেশকে কতকগুলি স্কুল-প্রদেশে ( School District ) ভাগ করা হবে। তারপর প্রত্যেকটি স্কুল-প্রদেশে কতগুলি করে স্কুল আছে এবং আর কতগুলি করে স্কুলের প্রয়োজন তা শিক্ষা বিভাগ নির্ণয় করবে। যদি এই পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে কোন বিশেষ স্কুল-প্রদেশে (School District) পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল নেই তখন সেই প্রদেশের শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল তৈরী করতে বলা হবে। প্রয়োজন হলে বাড়ী তৈরীর ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য তারা সরকারী সাহায্য পাবে। কিন্তু যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজনীয় স্কুলের চাহিদা মেটাতে না পারে তবে সেই প্রদেশে স্কুলবোর্ড নামে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এই বোর্ডের সদস্যেরা করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং তাঁরা প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত করবেন। তাঁরা সরকারের বরাদ্দ টাকা তো পাবেনই, উপরন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারবেন। স্কুলবোর্ড উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে ৫ বৎসর বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু আইনে তখনও পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বোর্ড পরিচালিত স্কুলগুলিতে কোন বিশেষ ধর্মগোষ্ঠী-সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হবে না, বা ছাত্রছাত্রীর উপর ধর্মসম্বন্ধীয় কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭০'র আইনে কোন একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। এতে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার তুলে দেওয়া হল—প্রথম, পুরাতন শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠান-গুলির উপর এবং দ্বিতীয়, নবগঠিত স্কুলবোর্ডের উপর। এই শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ছিল বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত। ফলে এদের স্কুলগুলি হল বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের আদর্শে গঠিত। কিন্তু বোর্ডের স্কুলগুলি হল ধর্মসম্পর্কবর্জিত এবং কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের আদর্শে গঠিত নয়। এই স্বেচ্ছাপ্রসূত স্কুলগুলি কিছুটা সরকারী এবং কিছুটা বেসরকারী অর্থ সাহায্যে চলত। তারা জনগণের দেওয়া করের কোন অংশ পেত না। কিন্তু বোর্ডের স্কুলগুলি সরকারী বরাদ্দ অর্থও জনগণের দেওয়া করে চলত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এ দ্বৈতশাসনের নীতির বহু তীব্র সমালোচনা হলেও ১৮৭০ সালের আইনের অবদান প্রচুর। এর দ্বারা স্কুলের অভাব ধীরে ধীরে পুরণ করার ব্যবস্থা হল। যে-সব জায়গায় স্কুলের অভাবে ছেলেমেয়েরা পড়তে পেত না, সে-সব জায়গায় একের পর এক স্কুল গড়ে উঠল। এই আইনটি যদি পাশ না হত তবে ইংলণ্ডের জনগণকে আরও বহু বৎসর অজ্ঞতার তিমিরে বাস করতে হত।

১৮৯৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নাম শিক্ষা-বিভাগ (Education Department) দেওয়া হল। ১৯০২ সালে আর একটি শিক্ষা-আইন পাশ হয়। এই বিলটির উত্থাপক ছিলেন সেই সময়কার প্রধান মন্ত্রী, এ. জে. ব্যালফোর। বিলটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুল পরিবর্তন আনে।

**১৯০২ সালের শিক্ষা আইন ঃ**

এই আইনের দ্বারা এতদিনের স্কুলবোর্ডগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া হল। স্কুলবোর্ডগুলি কোন বিশেষ নিয়ম বা নীতি অনুযায়ী গঠিত হয়নি—ইতস্তত যেমন যেখানে দরকার সেইরকম স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০২'র আইনে স্কুলগুলিকে মিউনিসিপাল অঞ্চল অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা হল। স্কুলবোর্ডের জায়গায় এল কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিল।

শাসনের সুবিধার জন্য ইংলণ্ড দেশটিকে কতকগুলি কাউন্টিতে এবং কাউন্টি বারো'তে ভাগ করা হয়েছে। কাউন্টির চেয়ে কাউন্টি বারো আয়তনে বড়। কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিল সংখ্যায় দাঁড়াল ১২০ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষার দায়িত্ব পড়ল এই কাউন্সিলগুলির উপর। এই কাউন্সিলগুলিকেই স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (Local Education Authority ) বা সংক্ষেপে ইংরেজীতে এল-ই-এ ( L. E. A. ) বলা হল। প্রত্যেকটি এল-ই-এ'র সঙ্গে একটি করে শিক্ষা কমিটি সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং অর্থঘটিত ব্যাপার ছাড়া আর সব ব্যাপারই এই কমিটির কাছে উপস্থাপিত করতে হবে।

এই কাউন্সিলগুলির হাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির সমস্ত স্কুলগুলির ভার পড়ল এবং ফলে পূর্বের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার লোপ ঘটল। যে স্কুলগুলি পূর্বে বোর্ডের তৈরী ছিল সেগুলির নাম দেওয়া হল প্রোভাইডেড (Provided) এবং যেগুলি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ছিল সেগুলির নাম দেওয়া

হল নন্‌-প্রোভাইডেড ( Non-Provided )। এ উভয় স্কুলেরই তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল এল-ই-এ'র উপর। এই আইনের দ্বারা ধর্মসম্প্রদায়ের স্কুলগুলিও ধার্য করের অংশ পাবার অধিকারী হল, কিন্তু বাড়ী তৈরী, পরিবর্তন, ইত্যাদির ব্যয় বহন করার দায়িত্ব রইল সংশ্লিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়টির উপর। অ-সাহায্যপ্রাপ্ত ( Non-Provided ) স্কুলের পরিচালকদের শিক্ষক নিয়োগ করা ও বরখাস্ত করার অধিকার অব্যাহত রইল, অবশ্য এল-ই-এ'র অনুমোদন সাপেক্ষে।

১৯০২'র আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনকে কিছুমাত্রায় দূর করলেও সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি। কেননা, সেই সাহায্যপ্রাপ্ত ও অ-সাহায্যপ্রাপ্ত দু ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিকই পূর্বের মত অব্যাহত রইল। কিন্তু পূর্বের বিশৃঙ্খল ও অসংহত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল ১৯০২'র আইনটি।

## ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইন ঃ

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হল এবং শেষ হয় ১৯১৮ তে। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ইংলণ্ডে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আইন পাশ হল। এটির নাম ফিশার এ্যাক্ট ( Fisher Act ), তৎকালীন শিক্ষাবোর্ডের সভাপতির নাম অনুযায়ী। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই আইনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। এই আইনের দ্বারা এল-ই-এ'র ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবার থেকে প্রয়োজন হলে তারা শিক্ষাবোর্ডের কাছে নিজেদের কর্মসূচী বা পরিকল্পনা পেশ করতে পারবে। মোট টাকারও পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতনগ্রহণ প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হল। তাছাড়া প্রয়োজন বুঝলে এল-ই-এ নার্সারি স্কুল বা নার্সারি ক্লাশের ব্যবস্থাকরণে সাহায্য করতে পারবে। ছেলে মেয়েদের দৈহিক ব্যায়াম, খেলাধূলায় সাহায্য করা এবং খেলার মাঠ, স্নানাগার ইত্যাদি গঠনে সাহায্য করারও অধিকার এল-ই-এ'কে দেওয়া হল। ১২ বৎসরের নীচে ছেলেমেয়েদের কোনরূপ কাজে লাগান একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং তার উপরের বয়সের ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানর প্রথাও বেশ নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হল।

১৯১৮ সালের আইনটি যে বেশ প্রগতিশীল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এতে নার্সারি স্কুলকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে তোলা হয়েছে।

### হ্যাডো রিপোর্ট—১৯২৬ঃ

১৯২৬ সালে স্যার ডব্লিউ এচ হ্যাডোর সভাপতিত্বে একটি কমিটি বসে এবং এই কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটির নাম প্রাপ্তযৌবনদের শিক্ষা ( Education of the Adolescent )। অবশ্য এটি সাধারণত হ্যাডো রিপোর্ট বলেই পরিচিত। হ্যাডো রিপোর্টের একটি প্রস্তাব হল যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবে ১১+ বয়সে অর্থাৎ ১১ থেকে ১২ বৎসরের মধ্যে। তারপরে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও শক্তি অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি বিভিন্ন হবে। কিন্তু ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে। এর পরের স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা নানাধর্মী হবে, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী এবং তার জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির স্কুল থাকবে। যেমন গ্রামার স্কুল, মডার্ন স্কুল এবং কারিগরী শিক্ষার স্কুল। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে হ্যাডো রিপোর্টের প্রণয়নকারীরা ধরে নিয়েছিলেন যে ১১ বা ১২ বৎসর বয়সের সময় ছেলেমেয়েদের মনে বিরাট একটা পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেইজন্য পুরানো শিক্ষার ব্যবস্থা বদলে দিয়ে তাদের প্রয়োজন মত নতুন ধারায় নতুন বিষয় শেখানোর সময় আসে। সেই জন্যই তাঁরা ১১+ তে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বিভিন্নধর্মী মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দেশ দেন। তাঁদের এই নির্দেশ যে যথেষ্ট বিজ্ঞোচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু ১১+ তে শিক্ষার প্রকৃতি পরিবর্তনের যে সুনির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা সীমারেখা তাঁরা টেনে দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বহু মনোবিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যাহোক হ্যাডো রিপোর্টের এই নির্দেশকে মেনে নিয়েই ১৯৪৪'এর শিক্ষা আইন গঠিত হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে হ্যাডো রিপোর্টের একটা বড় গুরুত্ব হল এই যে প্রথম এই রিপোর্টেই প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সীমারেখা টানার কথা ওঠে। ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা এমনভাবে সংযুক্ত ছিল যে তাদের মধ্যে স্তরগত কোনরূপ পার্থক্য নির্ণয় করা যেত না। হ্যাডো রিপোর্টই প্রথম এই বিভেদীকরণের নির্দেশ দেয়। হ্যাডো

রিপোর্টের এই নির্দেশের সার্থকতা সকলেই উপলব্ধি করলেন। ১৯২৮ সালে শিক্ষাবোর্ড "শিক্ষার নতুনরূপ" ( New Prospect in Education ) নামে একটি পুস্তিকায় শিক্ষার পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। ১৯৩৬ সালের একটি শিক্ষা আইনের সাহায্যে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়ানো ও সাহায্যদানের সর্তাদি আরও শিথিল করা হল।

**১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন ঃ**

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার এই পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় ১৯৪৪ সালের প্রসিদ্ধ শিক্ষা আইনের দ্বারা। এই আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ শিক্ষাকালটিকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করা হবে যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর ( Further )। ইতিপূর্বে তথাকথিত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা পড়ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষার অনেকখানি সেখানে দেওয়া হত। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনে এই ধরনের মিশ্রিত স্কুলগুলি উঠিয়ে দেওয়া হল। এখন যে প্রাথমিক স্কুলগুলি তৈরী হবে তাতে ছেলেমেয়েরা ১১+ বৎসর বয়সের বেশী পড়তে পাবেনা। তারপর তাদের চলে যেতে হবে কোন না কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

১৯৪৪ সালের আইনের ১১৪ ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বরূপ ও কার্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় তার নাম প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে ১২ বৎসর বয়সের নীচ পর্যন্ত। ( ১৯৪৮'র আইনে এই বয়সটিকে সুনির্দিষ্ট করে ১০½ বৎসর পর্যন্ত স্থির করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন বুঝলে তার চেয়ে অধিক বয়সের ছেলেমেয়েদেরও ঐ সংগে পড়ানো যেতে পারে। ) অতএব দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান আইন অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্গত হয়ে পড়ল—(ক) নার্সারি বিদ্যালয়গুলি, যেখানে ৫ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়েরা পড়তে পারবে। (খ) শিশু বিদ্যালয়গুলি (Infant Schools), যেখানে ৫ থেকে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে। (গ) জুনিয়র স্কুলগুলি ( Junior Schools ), যেগুলিতে ৭ বৎসর থেকে প্রায় ১২ বৎসরের অনধিক ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে। (ঘ) শিশু-ও-জুনিয়র বিদ্যালয়গুলি, ( Infant and Junior Schools ) যেগুলিতে ৫ বৎসর বয়স থেকে ১২ বৎসরের অনধিক ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে।

## ৩। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম

**নার্সারি স্কুল ( Nursery School ) ঃ**

১৯১১ সালে র‍্যাচেল ম্যাক্‌মিলান ও মার্গারেট ম্যাকমিলান নামে দুই ভগ্নী ডেপ্‌টফোর্ডে প্রথম নার্সারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে শিক্ষাবোর্ড ৫ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুলের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তবে এ বয়সে স্কুলশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা দুই থেকে পাঁচ বছরের অন্তবর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নার্সারি স্কুলের ব্যবস্থা করা বা নার্সারি স্কুলকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা এল-ই-এ'কে দেওয়া হয়েছিল। এই আইনটি পাশ হওয়ার মূলে ছিল ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয়ের নার্সারি স্কুল আন্দোলন।

মার্গারেট ম্যাক্‌মিলান ইতিপূর্বে একটি স্কুল-চিকিৎসা বিভাগ এবং স্কুল-ক্লিনিকের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানে তিনি এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিলেন যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ না হওয়ার ফলেই অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের নানারূপ ব্যাধি দেখা দেয়। এইজন্য তাঁর নার্সারি স্কুলে যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গঠনের দিকে তিনি অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। উন্মুক্ত আবাসস্থল, বাগান, ঘাসের জমি, গাছ-পালা এবং সর্বোপরি প্রচুর খোলা জায়গা ছিল তাঁর স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রুসো, ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, অবাধ অংগসঞ্চালন ইত্যাদিকে তাঁর শিক্ষার পরিকল্পনায় প্রধান স্থান দিয়েছিলেন।

এল-ই-এ'র হাতে নার্সারি স্কুল স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হলেও বহুদিন এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয়নি। ১৯৩৮ সালে এল-ই-এ পরিচালিত নার্সারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৬টি এবং স্বাধীন কর্তৃপক্ষ পরিচালিত নার্সারি স্কুলের সংখ্যা ৫৭টি। যুদ্ধের পর নার্সারি স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সকলে বিশেষ করে উপলব্ধি করলেন এবং ১৯৪৭ সালে এল-ই-এ পরিচালিত নার্সারি স্কুলের সংখ্যা হল ৩৫৩টি, স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিতের সংখ্যা

মাত্র ১৭টি। কিন্তু তারপর থেকে শিক্ষাদপ্তর নার্সারি স্কুলের ব্যাপারে বেশ কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়েন। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য এত বেশী বাড়ীর প্রয়োজন দেখা দিল যে শিক্ষাদপ্তর নার্সারি স্কুলের প্রসারের দিকে তেমন আর নজর দিতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে মোট নার্সারি স্কুলের সংখ্যা ৩৯৮টিতে ওঠে এবং সেই থেকে প্রতি বৎসরেই কিছু না কিছু সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

স্বাধীন নার্সারি স্কুলগুলিকে শিক্ষাবোর্ড প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। কর্মরতা মেয়েদের পক্ষে এই ধরনের স্কুলগুলি পরম সহায়ক। বর্তমানে অধিকাংশ নার্সারি স্কুলই মুক্ত-প্রাংগন প্রকৃতির। সেগুলিতে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং দৈহিক বৃদ্ধির হিসাব রাখার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্কুলে শিশুর বুদ্ধি, দক্ষতা, স্বভাবের বিকাশেরও বিবরণী রাখা হয়। স্নান, গা-হাত পরিষ্কার করা, পোষাক পরা, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি ব্যাপারে ভাল অভ্যাস গঠনের উপরই নার্সারি স্কুলগুলিতে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়। খেলাধূলার পেছনেও প্রচুর সময় দেওয়া হয় এবং ইন্দ্রিয়-চর্চা ও বাচন সম্বন্ধে সু-অভ্যাস গঠনও নার্সারি স্কুলের শিক্ষার অন্তর্গত।

**শিশু স্কুল ( Infant School ) ও কিশোর স্কুল ( Junior School ) ঃ**

ইংলণ্ডের প্রথম শিশু স্কুল স্থাপন করেন রবার্ট আওয়েন ১৮১৬ সালে। দুই থেকে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই স্কুলটি তৈরী হয়েছিল এবং পাঠ-ক্রমের অন্তর্গত ছিল এমন সব প্রয়োজনীয় বিষয় যা ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে। তার সংগে ছিল গান, নাচ ও খেলা। আওয়েনের এই স্কুল যে খুব প্রগতিশীল এবং পরবর্তী যুগে ইংলণ্ডের শিশু শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয় সন্দেহ নেই। স্যামুয়েল উইল্ডারস্পিন নামে আরও এক ব্যক্তি শিশুশিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে শিশু শিক্ষার প্রসার হয় এবং ব্রিটিশ ফরেন সোসাইটি এবং ন্যাসানাল সোসাইটির প্রযোজনায় অনেকগুলি মনিটোরিয়াল প্রকৃতির স্কুল স্থাপিত হয়। এগুলিতে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হত এবং তার সঙ্গে লিখন, পঠন ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞানদানেরও ব্যবস্থা ছিল।

১৮৬২ সালে কিশোর স্কুলগুলির পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্য দানের প্রথা প্রচলিত হল। এর ফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটিই যান্ত্রিকতায়

পরিণত হল। শিশু স্কুলগুলিতে অর্থাৎ ছ'বছরের নীচের ছেলেমেয়েদের স্কুলে এই প্রথা প্রবর্তিত না হওয়ায় সেখানে নিজস্ব মৌলিকতা ও অভিনবত্ব বজায় রাখার অবকাশ ছিল। ১৮৯৭ সালে এই ক্ষতিকর প্রথাটি একেবারে উঠে যায়।

১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনে শিশু ও কিশোর শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়। এখন ইংলণ্ডে বহু শিশু স্কুল আছে যেখানে কেবল মাত্র শিশুরা পড়ে। কেবল শিশু বিদ্যালয়ের সংখ্যাই উপস্থিত শিশু-ও-কিশোর বিদ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে বেশী। ১৯৫৩ সালে শিশু ও কিশোর স্কুলের মোট সংখ্যা ছিল ৯,৩৩৬, তার মধ্যে কেবল শিশু স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫,৪৭৫।

শিশু স্কুল বা কিশোর স্কুল কিংবা শিশু-ও-কিশোর স্কুল প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানে থাকেন একজন করে শিক্ষণসম্পন্ন (trained) এবং একজন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ( certificated ) প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা। শিশু স্কুলের ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রধান শিক্ষিকার হাতে ভার থাকে। সাধারণত পল্লীগ্রাম অঞ্চলের স্কুলগুলিতে প্রতি ক্লাসে ১৬ থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে, আর সহর অঞ্চলের স্কুলগুলিতে থাকে ৩৬ থেকে ৪০ জন। তেমনি আবার সহর অঞ্চলের স্কুলগুলিতে বয়স, সামর্থ্য প্রভৃতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয় কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তা করা সম্ভব হয় না এবং বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন সামর্থ্যের ছাত্রছাত্রীদের একই ক্লাসে একসঙ্গে পড়তে হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ক্লাসে অত্যধিক ছেলেমেয়ে একসংগে পড়লে শিক্ষার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, এইটি ইংলণ্ডের বহু শিক্ষাবিদ্‌দের মত এবং শিশু ও কিশোর বিদ্যালয়গুলির ক্লাসে অনুমোদিত সর্বোচ্চ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হল ৪০। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে বহুক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর এই সংখ্যা পার হয়ে গিয়েছে। ব্রিটেনের শিক্ষাদপ্তর এ বিষয় যথেষ্ট সচেতন থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না।

আগেকার কিশোর বিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র পড়া, লেখা ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের উপরেই জোর দেওয়া হত। কিন্তু আধুনিক কিশোর বিদ্যালয়গুলিতে সক্রিয়তা ও মৌলিক অভিজ্ঞতা লাভের উপর

বেশী জোর দেওয়া হয়। খেলাধূলা, গল্পকথন, আলাপন, বাচন-শিক্ষা প্রকৃতি-বীক্ষণ, অঙ্কন, সংগীত, নৃত্য, হাতের কাজ ইত্যাদি হল আধুনিক কিশোর স্কুলের পাঠক্রমে অংগ। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষার গঠনে যেমন কিণ্ডার গার্টেনের প্রচুর প্রভাব ছিল তেমনিই ব্রিটেনের প্রাথমিক শিক্ষার' সংগঠনে কিশোর স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করেছিল।

**সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ**

১৯০২'র আইনের দ্বারা দু-ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল—প্রোভাইডেড ও নন প্রোভাইডেড ( ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) এ দু-ধরনের বিদ্যালয়ই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্গত এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের পরিশাসনের অধীন।

**বেসরকারী স্কুলঃ**

রাষ্ট্র পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ইংলণ্ডে বহু বেসরকারী স্কুল আছে। এই স্কুলগুলির মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঠিক জানা যায় না। তবে এটা জানা গেছে যে ৬ থেকে ১৪ বছরের প্রায় ৪ লক্ষের কাছাকাছি ছেলেমেয়ে হয় বাড়ীতে, নয় বেসরকারী স্কুলে পড়ে।

## ৪। মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে দু-ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রচলিত ছিল—দান-প্রাপ্ত ( endowed ) এবং প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত। দান-প্রাপ্ত স্কুলগুলিকে গ্রামার স্কুলও বলা হত। এগুলি বয়সে বহু প্রাচীন এবং এগুলিতে রোমান, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শেখান হত বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল গ্রামার স্কুল। গ্রামার স্কুলগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ইটন এবং উইন্‌চেষ্টারও এই ধরনের দু'টি গ্রামার স্কুল। প্রথমটির প্রতিষ্ঠাতা ষষ্ঠ হেনরী এবং দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা উইকহামের উইলিয়ম। এই স্কুলগুলি সাধারণ স্কুলের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ও স্বতন্ত্র হওয়ায় এগুলি পাব্লিক স্কুল ( Public School ) নামে খ্যাত। পাব্লিক স্কুলগুলি সাধারণত আবাসিক ধর্মী এবং পড়াশোনা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সব দিক দিয়ে সেগুলির একটা স্বতন্ত্র মান থাকে। এই ধরনের আরও কয়েকটি পাব্লিক স্কুলের নাম করা যায় যেমন, ওয়েষ্টমিনিষ্টার রাগবি, ক্যাণ্টারবারি ইত্যাদি।

এই স্কুলগুলির অধিকাংশই দরিদ্র জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য তৈরী হয়েছিল এবং প্রথম প্রথম কোনরূপ বেতন নেওয়া হত না বা নিলেও অল্প বেতন নেওয়া হত। কিন্তু কালক্রমে সাহায্যের পরিমাণ এত বেড়ে উঠল যে এগুলি ধীরে ধীরে এক একটি বিরাট এবং ব্যয়বহুল আবাসিক স্কুলে পরিণত হল এবং বিত্তবান পিতামাতারা ছাড়া এগুলিতে পড়ানোর ক্ষমতা সাধারণ পিতমাতার রইল না। বলা বাহুল্য বর্তমানে পাব্লিক স্কুলগুলি তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য থেকে বহুদূরে সরে এসেছে।

গ্রামার স্কুলের শিক্ষকদের স্থানীয় বিশপের কাছ থেকে শিক্ষকতার জন্য একটি অনুমতি পত্র নিতে হত। এই প্রথাটা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবশ্য এ অনুমতি পত্র নিতে হত না। ১৮৬৯ সালের দান-প্রাপ্ত স্কুলের আইনের দ্বারা এই প্রথাটি বিলুপ্ত করা হয়।

গ্রামার স্কুলে প্রধানত পড়ান হত প্রাচীন ভাষা। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা পড়তে ও লিখতে শেখাই ছিল একমাত্র পাঠক্রম। তবে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে হিব্রুও পড়তে হত। পড়ানোর পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক। ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ইত্যাদি প্রাচীন ভাষাগুলির কোনরূপ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও এগুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্গত করার পিছনে ছিল মানসিক শৃঙ্খলা ( Mental Discipline ) নামে একটি ভুল মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বিশ্বাস। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের চর্চা করলে মনের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং ল্যাটিন, গ্রীক ইত্যাদি প্রাচীন ভাষাগুলি হল এই ধরনের বিষয়। তখনকার শিক্ষকেরা মনে করতেন যে এই ভাষাগুলির অধ্যয়ন মনের ব্যায়ামের কাজ করে। বর্তমান গবেষণায় মানসিক শৃঙ্খলার এই তত্ত্বটি ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা সম্বন্ধে এই ধারণাটি এতই দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে প্রাচীন ভাষা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ই গ্রামার স্কুলগুলিতে পড়ান হতনা। তাছাড়া বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদও গ্রামার স্কুলে অন্য কোন বিষয় পড়ানোর বিরোধী ছিলেন। তার ফলে গ্রামাঞ্চলের গ্রামার স্কুলগুলোর কোনরূপ উপকারিতাই ছিলনা এবং বহুক্ষেত্রে কোন ছাত্রই পাওয়া যেত না। গ্রামার স্কুলগুলির পাঠক্রমই কেবলমাত্র অনুপোযোগী ছিল তা নয়। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও খুব ভাল ছিলনা। কঠিন নিয়মে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হত এবং নিষ্ঠুর শাস্তি দানের প্রথা প্রচলিত ছিল। ফলে ছাত্রমণ্ডলীর এবং প্রধান শিক্ষকের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ দেখা দিত। এর প্রধান কারণ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিলনা এবং তাদের অবসর সময় সন্তোষজনক ভাবে যাপন করার কোনরূপ শিক্ষা তারা পেতনা। বহু পাবলিক স্কুলে নানা প্রকার দুর্নীতি শিক্ষকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

**প্রাইভেট স্কুল ঃ**

এই দান-প্রাপ্ত পাবলিক এবং গ্রামার স্কুল ছাড়াও আর এক শ্রেণীর মাধ্যমিক বিত্যালয় ছিল। সেগুলিকে প্রাইভেট স্কুল ( Private School ) বলা হত। থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতির নভেলে এই ধরনের স্কুলের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্কুলগুলি ব্যক্তি বিশেষদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল।

এই স্কুলগুলি ভালয় মন্দয় মিশান ছিল। যে কোন পাবলিক স্কুলের চেয়ে এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের আরও বেশী তত্ত্বাবধান করা হত। পাঠক্রম অবশ্য গ্রামার স্কুলেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু অত বেশী বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। সেজন্য প্রাচীন ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিখানোর সুযোগ এখানে বেশী ছিল। যে সব অভিভাবকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন তাঁরা চাইতেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা আধুনিক আবশ্যকীয় বিষয় কিছু শিখুক। ফলে দেখতে দেখতে গণিত, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল এবং আধুনিক ভাষা খুব সহজেই প্রাইভেট স্কুলের পাঠক্রমে স্থান পেয়ে গেল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া হত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে।

প্রাইভেট স্কুলেতে শিক্ষার নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করবার অবকাশও অধিক ছিল এবং তার ফলে সেই সময়কার কতকগুলি প্রাইভেট স্কুলকে বেশ প্রগতিশীল বিদ্যালয় বলে গণ্য করা যায়। দান-প্রাপ্ত পাবলিক এবং গ্রামার স্কুলগুলি প্রধানত ছেলেদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। মেয়েদের পড়তে হত প্রাইভেট স্কুলে। মেয়েদের পাঠ্য বিষয় ছিল ফরাসী এবং ইটালিয়ান ভাষার কিছু কিছু, অঙ্কন এবং সূচীশিল্প, সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র। এ ছাড়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শেখানো হত সাধারণ জ্ঞান। তখন বিবাহকেই মেয়েদের একমাত্র ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বলে মনে করা হত এবং স্কুলে সেই উদ্দেশ্যেই মেয়েদের প্রস্তুত করা হত। তাদের সত্যকারের কোনরূপ মানসিক উন্নতি বা শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ছিলনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে প্রচলিত গ্রামার স্কুলের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এর প্রাচীনভাষা-সর্বস্ব পাঠক্রম, অস্বাস্থ্যকর আবাস-ব্যবস্থা এবং নীতি-বিরোধী আবহাওয়া ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা নানা দিক থেকে বর্ষিত হতে লাগল। একদিকে যেমন মিল, বেন্থাম প্রভৃতি জন-কল্যাণবাদীরা এই ধরনের পাব্লিক ও গ্রামার স্কুলগুলির নিষ্ক্রিয় পাঠক্রমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তেমনই ধর্মযাজকগণ সেখানকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন সুরু করলেন। তাছাড়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী নাগরিকরাও পাব্লিক এবং গ্রামার স্কুলগুলির বাস্তবজীবনের পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। এই সময় পর পর কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি পাব্লিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন এবং কয়েক

বৎসরের মধ্যে পাব্লিকস্কুলের সুনাম ফিরিয়ে আনেন। স্যামুয়েল বাটলার, বেঞ্জামিন কেনেডি, টমাস আর্নল্ড প্রমুখ প্রধান শিক্ষকরা প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়, পদ্ধতি ইত্যাদির আমূল সংস্কার করেন এবং পাব্লিক স্কুলগুলির সামনে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে টমাস আর্নল্ডের অবদানই ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, আদর্শ-বাদী ও দৃঢ়চিত্ত এই প্রধান শিক্ষকটি তাঁর প্রতিভাবলে গ্রামার স্কুলগুলির নতুনরূপ দান করেছিলেন। অনেকের মতে যদি বাটলার, কেনেডি, আর্নল্ডের মত লোক তখন না দেখা দিতেন তবে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে চলে যেত।

### ক্ল্যারেণ্ডন কমিশন—১৮৬৪ঃ

পাব্লিক স্কুলগুলির আদর্শ, পদ্ধতি, রীতিনীতি প্রভৃতির সংস্কার সাধন হলেও প্রচলিত পাঠক্রমের গলদ দূর হল না। ১৮৬১ সালে লর্ড পামারষ্টোনের সরকার প্রধান প্রধান পাব্লিক স্কুলগুলির আয় পরিচালনা ও পাঠক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি ক্ল্যারেনডন কমিশন ( Clarendon Commi-ssion ) নিযুক্ত করেন। এই কমিশন পাব্লিক স্কুলগুলির ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রশংসা করলেও সেগুলির প্রচলিত পাঠক্রমের তীব্র সমালোচনা করেন। কমিশন জার্মানীর জিম্‌নাসিয়ামের ( Gymnasium ) অনুকরণে প্রাচীন ভাষা ও ধর্মশিক্ষার সঙ্গে গণিত, ফরাসীভাষা বা জার্মানীভাষা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সঙ্গীত, অঙ্কন ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া পাব্লিক স্কুলগুলির পরিচালক-মণ্ডলীর সংস্কারসাধন করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এই কমিশন দিলেন। এই নির্দেশগুলির ফলে ১৮৬৮ সালে পাব্লিক স্কুল আইন পাশ হল এবং পাব্লিক স্কুলগুলির পাঠক্রম ও পরিচালকমণ্ডলীর সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা হল।

### টৌণ্টন কমিশন—১৮৬৮ঃ

১৮৬৮ সালে টৌণ্টনের ( Lord Taunton ) নেতৃত্বে গঠিত স্কুল ইনকোয়ারী কমিশনের (School Enquiry Commission) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই কমিশনের কাজ ছিল প্রাথমিক স্কুল এবং পাব্লিক স্কুল ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্যা অনুসন্ধান করা। এই কমিশন

দান-প্রাপ্ত এবং প্রাইভেট স্কুল মিলিয়ে মোট ৯৪২টি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর নানা প্রস্তাব করেন। যেমন, অল্পবিত্তশালী নাগরিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য নিম্নবেতনের স্কুলের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে হবে। পাঠক্রমে প্রাচীনভাষা থাকুক কিন্তু গণিত, আধুনিক ভাষা এবং বিজ্ঞান তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। শিক্ষাবৃত্তির প্রতি সত্যকারের যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে আকৃষ্ট হয় তার জন্য তাদের ভাল পারিশ্রমিক দিতে হবে।

তাছাড়া এই কমিশন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষরূপে একটি পরিশাসক-সংস্থা গঠনের নির্দেশ দেন। প্রত্যেকটি দান-প্রাপ্ত স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে পরিদর্শন করার ব্যবস্থা হবে। মাধ্যমিক স্কুলগুলির পরিচালনার ভার থাকবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে। শিক্ষকদের পরীক্ষা করে তাদের যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত শিক্ষকদের একটি তালিকা রাখা হবে। স্কুলের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে।

বলাবাহুল্য টৌণ্টন কমিশন বা স্কুল ইনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্টটি মূল্যবান এবং পরবর্তী যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার যে পুনর্বিন্যাস হয়েছিল তার প্রচুর আভাষ এই কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায়।

### পাব্লিক স্কুল এ্যাক্ট—১৮৬৮ :

১৮৬৮ সালে পাব্লিক স্কুল এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনে ক্ল্যারেণ্ডন কমিশন পাব্লিক স্কুল সম্বন্ধে যে নির্দেশগুলি দিয়েছিলেন সেগুলিকে কার্যকরী করা হয়। এই আইনের আওতায় মাত্র ৭টি পাব্লিক স্কুল পড়েছিল। এই আইনের দ্বারা স্কুলগুলির পরিচালকমণ্ডলী নতুন করে সংগঠিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে স্কুলের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নি।

### এনডাউড্ স্কুল এ্যাক্ট—১৮৬৯ :

১৮৬৯ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন এনডাউড্ স্কুল আইনটি পাশ করেন। এই আইনে টৌণ্টন কমিশনের অধিকাংশ নির্দেশকেই অগ্রাহ্য করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থাপনের কোনই ব্যবস্থা করা হয় না কিংবা দান-প্রাপ্ত ( endowed ) স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলক পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিও প্রবর্তন করা

হয় নি। শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত করার প্রথাও চালু করা হয় নি। এই আইনে কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যদানের নিয়মকানুনগুলির সংস্কারসাধন করা হয়। সরকারী অর্থসাহায্য যাতে যথাযথভাবে দেওয়া হয় তার জন্য তিনজন বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত হলেন। মেয়েরাও যাতে অর্থসাহায্যের অংশ পায় তার জন্যও এই আইনে ব্যবস্থা করা হল। পাব্লিক স্কুল ও প্রাথমিক স্কুলগুলি এই আইনের আওতায় পড়ল না।

**ক্রস কমিশন—১৮৮৮ ঃ**

১৮৮৮ সালে ক্রস্ কমিশন ( Cross Commission ) নিযুক্ত হয় প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও এতে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত দেওয়া হয়। এই কমিশনে উন্নত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উপর হস্তক্ষেপ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উন্নত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সার্থকতা তাঁরা একদিক দিয়ে স্বীকার করলেন। তবে এই ধরনের স্কুলে সেই সব ছেলেমেয়েরাই পড়বে যারা ১৪ বা ১৫ বৎসর বয়সেই লেখাপড়া শেষ করে জীবিকা অর্জন করতে সুরু করবে। কিন্তু এই কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা হল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষা এবং যারা ১৬ বা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেদহীনভাবে পড়াশোনা করে যাবে তাদের জন্যই এই মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োজন থাকবে। এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উন্নত প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতিটি ঠিক কি তা কখনই সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা যথেষ্ট বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ ছিল। স্কুলবোর্ড তৈরী হওয়ার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সুনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া সেগুলি সরকারী সাহায্য এবং জনসাধারণ প্রদত্ত কর বাবদ অর্থ পেত। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের কোন সুব্যবস্থা তখনও হয়নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের সাহায্য এবং ছাত্র-বেতনের উপর স্কুলগুলি নির্ভরশীল ছিল। সেগুলি পরিচালিত হত পরিচালকমণ্ডলী বা ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারীদের দ্বারা। তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে স্কুলবোর্ড, কাউন্সিল বা নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির কোন প্রকৃত যোগাযোগ ছিলনা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমও সুনির্দিষ্ট ছিল না এবং প্রায় ক্ষেত্রেই স্কুলবোর্ড-পরিচালিত উন্নত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হত। এক কথায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা পরিকল্পনা ছিলনা এবং সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এই রকম একটি পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাইস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

**ব্রাইস কমিশন—১৮৯৫ :**

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য ১৮৯৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয়। জেমস্ ব্রাইস্ এর সভাপতি ছিলেন বলে এটি ব্রাইস্ কমিশন নামে খ্যাত।

১৮৯৫ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে একটি সুসংগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার পন্থা নির্ণয় করাই ছিল এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। এই কমিশন বহু আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের পর মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। তার সারাংশ নীচে দেওয়া হল।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ছিল, যেমন শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও কলাবিভাগ এবং চ্যারিটি কমিশন। কমিশন সুপারিশ করেন যে এগুলির সমন্বয় করতে পারে এমন একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার। এই কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি কার্যনির্বাহী সরকারী বিভাগ থাকবে এবং এই মন্ত্রীর হাতে প্রাথমিক শিক্ষারও ভার থাকবে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহেলা করে কিছু করা এই দপ্তরটির কাজ হবে না। মাধ্যমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক সংস্থাগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় আনাই এর প্রধান কাজ হবে। অনূর্ধ্ব ১২ জন শিক্ষায় অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হবে। ১৮৯৯ সালে একটি শিক্ষাবোর্ড আইন ( Board of Education Act ) পাশ হয় এবং এই নির্দেশগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়।

রিপোর্টে আরও বলা হয় যে প্রত্যেকটি কাউন্টি এবং কাউন্টি বারোতে সকল প্রকার মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে এমন একটি করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

গঠিত হবে। উন্নত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুলগুলিকে মাধ্যমিকের পর্যায়ে ফেলা হবে। এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ভার থাকবে যে সব অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সে সব অঞ্চলে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করার, অধীনস্থ অঞ্চলের সকল প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দেওয়ার, প্রয়োজনীয় সাহায্য করার এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার। বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলি এই স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে বাধ্য হবে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের অধীন হবে। এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থ আসবে সরকারী সাহায্য ও জনগণের প্রদত্ত কর থেকে।

(৩) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করবেন যদিও সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনার করার দায়িত্ব তাঁদের থাকবে না। পরিদর্শক নিয়োগের সময় অতীত অভিজ্ঞতার বিচার করা হবে এবং শিক্ষকদের নিয়োগ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ কমিশন দিয়েছিলেন। কমিশনের এই নির্দেশগুলি যে সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রগতিমূলক ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(৪) ব্রাইস কমিশনের আর একটি অভিমত এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিশনের আশঙ্কা হয়েছিল যে আধুনিক কারিগরী এবং বিজ্ঞানমূলক স্কুলগুলির চাপে প্রাচীন গ্রামার স্কুলগুলি হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। সেই জন্য তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কারিগরী ও বিজ্ঞানমূলক শিক্ষার প্রসার পর্যাপ্ত পরিমাণে হোক, কিন্তু তার ফলে যেন সাহিত্যধর্মী শিক্ষা অবহেলিত না হয়। কেননা এ ধরনের শিক্ষার সাক্ষাৎ কোন উপকারিতা দেখা না গেলেও চরিত্র ও মনের গঠনের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমালোচনা ব্রিটিশ শিক্ষার ইতিহাসে ব্রাইস কমিশনের রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সব প্রগতিমূলক শিক্ষাসংস্কার সম্পন্ন হয়েছিল তার অধিকাংশই কমিশনের নির্দেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

১৮৯৫ সালে ইংলণ্ডের শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিবরণী প্রকাশিত করেন। এর ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশৃঙ্খল ও অসংহত অবস্থাটা সকলের নিকট আরও প্রকট হয়ে

ওঠে। এই সময় যে সব বড় বড় স্কুলবোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালাত সরকার সেই বিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিলেন।

১৮৯৯ সালে শিক্ষা বিভাগের জায়গায় শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী, এ তিনরকম শিক্ষাব্যবস্থারই একমাত্র নিয়ন্ত্রক হল এই বোর্ড। তবে স্থানীয় পরিচালনার প্রশ্ন তখনও অনিশ্চিত রয়ে গেল।

**শিক্ষা-আইন—১৯০২ :** (বা বালফোর এক্ট)

এ সব সমস্যার সমাধান এল ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে স্কুলবোর্ডগুলি গঠিত হয়েছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে, যেখানে যেমন প্রয়োজন, অনেকটা ফাঁক পূরণ করার জন্য। এই আইনের দ্বারা দেশের শাসনমূলক ও স্বাভাবিক বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হল। স্কুল-বোর্ডগুলিকে তুলে দিয়ে ১২০টি কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিল স্থাপন করা হল। (এদের বলা হয় দ্বিতীয়াংশ কর্তৃপক্ষ বা Part II Authority) মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় প্রকার শিক্ষারই পরিচালনের ভার দেওয়া হল এদের হাতে। আর ১০০০০র বেশী জনসংখ্যা-সম্পন্ন বারো এবং ২০০০০ এর বেশী জনসংখ্যা সম্পন্ন সহরাঞ্চলের (এদের বলা হয় তৃতীয়াংশ কর্তৃপক্ষ বা Part III Authority) হাতে দেওয়া হল কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ভার। এদের সংখ্যা হল ১৮০টি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই আইনের বলে বিভিন্ন কাউন্সিলগুলিই হল স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ, সে পার্ট টু'ই হোক বা পার্ট থ্রিই হোক। এদের সংক্ষেপে এল-ই-এ (L.E.A.) বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি এল-ই-এ'র সঙ্গে থাকবে একটি করে শিক্ষা কমিটি যার কাছে এল-ই-এ'র কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ দাখিল করতে হবে।

১৯০২'র আইন অনুযায়ী এই শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলি দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে বাধ্য। প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষই নিজ নিজ অধীনস্থ অঞ্চলগুলির শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা বিচার করে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত মনে করবেন, শিক্ষাবোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে সেইমত ব্যবস্থা করবেন। এই হল আইনটির সুনির্দিষ্ট বিধান।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সুসংগঠনের অভাবে বহুদিন ধরে যে চরম

বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল ১৯০২'র আইনের ফলে তা দূর হয়ে গেল এবং তার জায়গায় একটি সুসংহত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কিন্তু তবুও এই আইনটি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হল না। ১৮৭০ সালের শিক্ষাব্যবস্থায় যে সরকারী ও বেসরকারী দ্বিবিধ স্কুল প্রথাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল এই আইনেও সেই দ্বৈতনীতিকেই সমর্থন করা হল। যে স্কুলগুলি সাক্ষাৎভাবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অধীনস্থ সেগুলির নাম দেওয়া হল প্রোভাইডেড্ (Provided) স্কুল। আর যে সব স্কুলগুলি স্বেচ্ছাসৃষ্ট (Voluntary) প্রকৃতির ছিল সেগুলির নাম হল নন-প্রোভাইডেড্ (Non-provided) স্কুল। উভয় ধরনের স্কুলই স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল এবং নন্ প্রোভাইডেড্ স্কুলগুলিও সংগৃহীত করের অংশ লাভের অধিকারী হল। তবে প্রোভাইডেড্ স্কুলগুলির সব খরচ যেমন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দেবেন, নন্ প্রোভাইডেড গুলির ক্ষেত্রে বাড়ী, আসবাব, গঠনমূলক পরিবর্তন, সংস্কারসাধন ইত্যাদির ব্যয় বহন করার দায়িত্ব সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি বা সংস্থার।

এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের স্বেচ্ছাসৃষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিল চার্চ এবং তার মধ্যে আবার বেশীর ভাগই ছিল ক্যাথলিক-ধর্মী চার্চ। কিন্তু ধর্ম নির্বিশেষে কর দিতে হয় সকলকেই। ফলে সমস্ত স্বেচ্ছাসৃষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে জনগণের দেওয়া করের অংশ দান করার বিরুদ্ধে ভীষণভাবে আন্দোলন চালালেন অনেকেই, বিশেষ করে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মীরা। কিন্তু সেই সময়কার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড ব্যালফোর কঠিন হস্তে এই আন্দোলন দমন করেন এবং আইনটিকে সর্বত্র কার্যকরী করে তুললেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দু ধরনের স্কুল দেখা দিল। প্রথম, পুরাতন গ্রামার স্কুল—এগুলি পূর্বে রাষ্ট্রকোষ থেকে কোনরূপ সাহায্য পেত না। এই আইনের ফলে তারা সাহায্য পেতে সুরু করল। দ্বিতীয়, কাউন্সিলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নতুন মাধ্যমিক স্কুল। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুল বলতে ঠিক কি বোঝায় তা তখনও নির্দিষ্টভাবে নির্ণীত হয়নি। ১৯৩৪ সালে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন (Regulations for Secondary Schools) প্রকাশিত হয়, তাতে মাধ্যমিক স্কুলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় হল সেই দিবাকালীন বা আবাসিক বিদ্যালয় যেখানে ছেলেমেয়েদের ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত কিংবা তার পরেও শারীরিক, মানসিক

এবং নৈতিক এই ত্রিবিধ সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং সে শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষার চেয়ে ব্যাপকতর ও উন্নততর প্রকৃতির হয়ে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষার আয়ুষ্কাল ৪ বছরের কম হবে না এবং পাঠক্রমে থাকবে ইংরাজী, অন্ততঃ আর একটি ভাষা, অঙ্ক ও বিজ্ঞান এবং অঙ্কন। শারীরিক শিক্ষণ এবং দৈহিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকবে। সঙ্গীতও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যদি ইংরাজী ছাড়া দু'টি ভাষা নেওয়া হয় তবে একটি যেন ল্যাটিন হয়। এই পাঠক্রমটি পরিষ্কারই গ্রামার স্কুল এবং পাব্লিক স্কুলে প্রচলিত পাঠক্রমের ছাঁচে ঢালা। কারিগরী বা অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

বহু বিদ্যালয়ের ভার এক সঙ্গে এসে পড়ায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অর্থের সমস্যা অনুভব করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে বেতন বৃদ্ধি করতে হয়। ১৯০৭ সালে ছাত্রবৃত্তি প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং মেধাবী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সমস্যাটা তাতে অনেক সহজ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক স্কুলে প্রায় শতকরা ২৫ জন শিক্ষার্থী এই ছাত্রবৃত্তি ভোগ করার অধিকারী হয়। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ছাত্রবেতন একেবারে লোপ করে দেওয়া হয়। তখন এই সমস্যাটা আর থাকে না।

এইসব নানাবিধ সংস্কারের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় এবং বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদির বিশেষ পরিবর্তন সাধন করা হয়। পূর্বের তুলনায় পাঠক্রমকে বিশেষভাবে প্রসারিত করা হয় এবং জীববিদ্যা, স্প্যানিস্ ভাষা, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্গত হয়। তাছাড়া শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) এবং শিক্ষার মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকদের আগ্রহ বাড়ার ফলে শিক্ষণ পদ্ধতিরও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। এই সময় বিশেষধর্মী বহু স্কুলও স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে। ডাল্টন প্ল্যান, প্রজেক্ট মেথড ইত্যাদি নানাস্থানে প্রবর্তিত হতে সুরু হয়। রেডিও, গ্রামোফোন, এপিডায়াস্কোপ প্রভৃতিও শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। কোন কোন স্কুলে স্ব-শাসন (Self Government) পদ্ধতিও পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তিত করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রাচীন ভাষার সমাদরও যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেল।

গ্রীক ভাষার প্রচলন বেশ হ্রাস পেল এবং দ্বিতীয় বিদেশী ভাষারূপে ল্যাটিনের প্রবর্তনও আর বাধ্যতামূলক রইল না। তাছাড়া বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলির শিক্ষায় আগের মত নিছক পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ না করিয়ে ব্যবহারিক দিকটার উপর জোর দেওয়া হল। মাধ্যমিক পাঠক্রমের এই প্রসারণের পিছনে ছিলেন থ্রিং (Thring), স্যাণ্ডারসন (Sanderson), হউসন (Howson) প্রভৃতি কয়েকজন সেই সময়কার সুবিখ্যাত প্রধান শিক্ষক। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে হার্বার্টসন (Herbertson), কিটিঞ্জ (Kitinge), রাউস্ (Rouse) প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা নানারূপ পরীক্ষণ চালান এবং নতুন নতুন শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। শিক্ষাবোর্ডেও এই সময় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনামা (Suggestions for Teachers) প্রকাশ করেন এবং বিশেষধর্মী শিক্ষার জন্য বিস্তারিত উপদেশ সম্বলিত বহু পুস্তিকা প্রচার করেন। মাধ্যমিক পাঠক্রমে বিজ্ঞান., আধুনিক ভাষা, প্রাচীনভাষা এবং ইংরাজী এই চারটি বিষয়ের স্থান সুনির্ণয়ের জন্য চারটি বিশেষ কমিটিও গঠিত হয়। এক কথায় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ব্যাপক ও বহুমুখী প্রচেষ্টা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এরপর আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের উপর একটা ঝড় বয়ে যায়। বিশেষ করে শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা এই যুদ্ধের ফলে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নতুন করে শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনের প্রয়োজন দেখা যায়।

### শিক্ষা আইন বা ফিসার আইন—১৯১৮ঃ

এই উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালে আর একটি শিক্ষা আইন পাশ হয়। সেই সময়কার শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি মিষ্টার ফিসার এই বিলটির স্রজক ছিলেন বলে আইনটিকে ফিসার অ্যাক্ট বলা হয়।

এই আইনের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান পরিবর্তন আনা হয়েছিল। যেমন—

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলির ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল। এখন থেকে প্রয়োজন হলে তাঁরা এই আইনটির দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা কি পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষাবোর্ডের নিকট পরিকল্পনা উপস্থিত করতে পারবেন।

বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যদানের প্রথারও পরিবর্তন করা হয়েছিল। স্থির হল যে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মোট ব্যয়ের অন্তত অর্ধেক সাহায্য হিসেবে দেওয়া হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণের প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হল। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলিকে প্রয়োজনমত নীচের প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হল।

(ক) নার্সারি স্কুল ও ক্লাস। (খ) যে সব যুবকেরা মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কন্টিনিউয়েসান স্কুলে ( Continuation School ) যোগদান করে তাদের জন্য ছুটীর দিনে ক্যাম্প। (গ) শরীর-চর্চার কেন্দ্র ও সাজসরঞ্জাম, খেলার মাঠ, স্কুল, স্নানাগার, স্কুল সন্তরণাগার। (ঘ) দিনে বা সন্ধ্যায় সামাজিক বা শরীরমূলক শিক্ষার নানা মাধ্যম।

বার বছরের চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের কোন কাজে লাগান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং এর উপরের বয়সের ছেলেমেয়েদের শ্রমিকনিয়োগও বেশ কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হল।

মাধ্যমিক ও কন্টিনিউয়েসান স্কুলে স্বাস্থ্য পরিদর্শনের প্রথা প্রবর্তিত করা হল।

বাধ্যতামূলকভাবে পূর্ণদিন স্কুলে যোগদানের বয়স ১৫ বৎসরে উন্নীত করার ক্ষমতা স্থানীয় শিক্ষাকর্তাদের দেওয়া হল এবং দিবাকালীন কণ্টি-নিউয়েসান স্কুল খোলা হল। এই নির্দেশটি অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত করা হয়নি। তবে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে অনেক ছেলেমেয়েদের অর্ধদিন স্কুলে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হত। এই আইনে সেই অর্ধদিন স্কুলের প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হল।

যে সব ছেলেমেয়েরা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে তারা ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত কন্টিনিউয়েসান স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করতে পারবে। বছরে ৩২০ ঘণ্টা এই স্কুলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক, তবে প্রয়োজন হলে প্রথম ৭ বৎসর এই সময়কে ২৮০ ঘণ্টায় কমান যেতে পারে। এর ফলে প্রত্যেক যুবককেই কিছুটা সময় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং কিছুটা সময় কোন কন্টিনিউয়েসান স্কুলে কাটাতে হবে। এইভাবে শিল্প এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মূল্যবান যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

এই আইনটির কতকগুলি সর্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, নার্সারি এবং কন্টিনিউয়েসান স্কুলকে ইংলণ্ডের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণের কালকে বৃদ্ধি করার পথনির্দেশও এই আইনে করা হয়েছে।

কন্টিনিউয়েসান স্কুল সম্বন্ধে আইন পাশ হলেও এই প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপ দিতে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শিল্পপতিদের সহযোগিতার অভাব, উপযুক্ত স্থানের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকদের অভাব ইত্যাদি কারণে ব্যাপকভাবে কন্টিনিউয়েসান স্কুল স্থাপনা করতে অনেক সময় লেগেছিল।

এরপর যুদ্ধোত্তর আর্থিক দৈন্যের ফলে সব দিক দিয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষার অগ্রগতি বেশ ব্যাহত হয়। ১৯২১ সালে জাতীয় ব্যয়ের একটি কমিটির নির্দেশে শিক্ষায় মোট সরকারী সাহায্যের এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে শিক্ষকদের বেতন কমে যায়, স্কুলবাড়ী ও সাজসরঞ্জামের ব্যয় কমান হয় এবং কন্টিনিউয়েসন স্কুল স্থাপনার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এক কথায় ইংলণ্ডের শিক্ষার অগ্রসর বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

১৯২৪ সালে শ্রমিকদল ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই নতুন শাসকেরা সমাজের অগ্রগতির জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। কিন্তু তখন মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝাত একমাত্র সাহিত্যধর্মী শিক্ষা, যা সেই সময়কার পাব্লিক স্কুল বা গ্রামার স্কুল-গুলিতে দেওয়া হত। মাধ্যমিক শিক্ষার এই সংকীর্ণ সংজ্ঞা তখনকার নেতারা গ্রহণ করলেন না। যে সব ছেলেমেয়েরা বাল্যকাল পার হয়ে যৌবনে পা দিয়েছে সেই সব প্রাপ্তযৌবনদের ( adolescents ) উপযোগী শিক্ষাকেই তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষা নাম দিলেন।

## হ্যাডো রিপোর্ট—১৯২৬ :

মাধ্যমিক শিক্ষার এই নতুন আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য শিক্ষা-বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটিকে পরিকল্পনা দাখিল করতে বলা হয়। ১৯২৬ সালে উপদেষ্টা কমিটি প্রাপ্তযৌবনদের শিক্ষার বিবরণী ( Report on the Education of the Adolescent ) নামে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন।

কমিটির চেয়ারম্যান স্যার হ্যাডোর নাম অনুসরণে রিপোর্টটিকে হ্যাডো রিপোর্ট বলা হয়ে থাকে। হ্যাডো রিপোর্টের মূল বক্তব্যগুলি হল এই :—

ইতিপূর্বে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের মাত্র শতকরা দশজন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগলাভের সৌভাগ্য ভোগ করত। হ্যাডো রিপোর্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১১ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর ( পরে ১৫ ) বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েই এবার থেকে স্বাভাবিক নিয়মে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সুনির্দিষ্ট একটি বিভাজন রেখা থাকবে এবং শিক্ষাথার ১১+বয়সে এই ছেদটি ঘটবে। আগে যে সব ষ্ট্যাণ্ডার্ড I থেকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড VII পর্যন্ত প্রাথমিক মাধ্যমিক মেশান ৭ বছরের ( যাতে শিক্ষার্থীরা ৭ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত পড়ত ) স্কুল ছিল সেগুলিকে এখন উঠিয়ে দেওয়া হল। এখন থেকে ছেলেমেয়েরা ১১+বয়সে প্রাথমিক স্কুল ছাড়বে এবং তারপর নিজেদের রুচি ও প্রয়োজনমত মাধ্যমিক স্কুলে যোগ দেবে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সংগঠিত হবে এবং নতুন ধরনের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দেবে।

বিভিন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্যের প্রতি সুবিচার করতে হলে বিদ্যালয়গুলিকেও বিভিন্ন প্রকৃতির করতে হবে। হ্যাডো রিপোর্টে প্রধানত তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণীর নাম দেওয়া হল গ্রামার স্কুল। জ্ঞান-ধর্মী বিদ্যালয় যত প্রকারের আছে সবই গ্রামার স্কুলের অন্তর্গত হবে। প্রধানত সাহিত্যমূলক বা বিজ্ঞানমূলক পাঠক্রম এই সব স্কুলে পড়ানো হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম দেওয়া হল মডার্ন স্কুল। ইতিপূর্বে লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টারে এক ধরনের উন্নত স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এগুলিতে ১১ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়ত। এদের পাঠক্রমে বাণিজ্যমূলক ও শিল্পমূলক বিষয়াদি শেখান হত। শিক্ষাবোর্ড এই ধরনের স্কুলগুলির উপকারিতা উপলব্ধি করেন নি, কিন্তু হ্যাডো কমিটি এদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেন। এই কমিটির মতে মডার্ন স্কুলে মোট পড়ানো হবে চার বছর এবং শেষের দু'বছর শিক্ষার প্রয়োগমূলক দিকটার উপর বেশী জোর দিতে হবে। যেখানে যেখানে মডার্ন স্কুল স্থাপন করা সম্ভব হবে না সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সিনিয়র ক্লাস ( Senior Class ) যুক্ত করে

দেওয়া হবে এবং ছেলেরা সেই ক্লাসে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

হ্যাডো কমিটি জুনিয়র কারিগরী ও শিল্পমূলক বিদ্যালয়গুলির কাজের প্রশংসা করেন এবং স্থানীয় শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলিকে পুষ্ট করে তোলার নির্দেশ দেন। এই ধরনের স্কুলে ঢোকার বয়স হবে সাধারণ ভাবে ১৩+। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধরনের স্কুল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংলগ্ন কারিগরী ক্লাস রূপে এগুলির অস্তিত্ব ছিল। পরে ১৯১৩ সাল থেকে জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল নামে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর স্কুল গড়ে ওঠে। ১৩ বছর বয়সের পর দুই বা তিন বছরের জন্য এগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হত।

হ্যাডো কমিটির বিশেষজ্ঞেরা মনে করতেন যে এগার বার বছরের সময় ছেলেমেয়েদের রক্তে যৌবনের আহ্বান দেখা দেয়। ফলে এ সময় তাদের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিশেষধর্মী, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন। যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও রীতি ও প্রকৃতি যে পরিবর্তিত হওয়া উচিত হ্যাডো কমিটির এই সিদ্ধান্ত সত্যই মনোবিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু বয়সের সীমারেখা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে অনেকেই হ্যাডো কমিটির সঙ্গে একমত নন। হ্যাডো কমিটি এই বয়সের সীমারেখাটি ১১+তে সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। এই বয়সে শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে হয় কোন গ্রামার স্কুলে, নয় কোন মডার্ন স্কুলে পড়বেই। যদি এ ধরনের কোন স্কুল সেখানে না থাকে তবে তারা সিনিয়র ক্লাসে যোগ দেবে। ১৩+বয়সে এদের মধ্যে আবার কোন কোন শিক্ষার্থীকে জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কারা প্রকৃতপক্ষে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে যোগদান করার যোগ্য তা নির্ণয় করার জন্য কমিটি প্রস্তাব করলেন যে একটি লিখিত ও সম্ভব হলে একটি মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং সেই পরীক্ষার ফলের উপরই শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজন হলে মডার্ন স্কুল থেকে গ্রামার স্কুলে বা গ্রামার স্কুল থেকে মডার্ন স্কুল বা জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলে যাতে শিক্ষার্থীদের স্থানান্তরিত করা যায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখারও নির্দেশ কমিটি দিয়েছিলেন।

এই প্রস্তাবিত মডার্ন স্কুল বা সিনিয়র ক্লাশ থেকে যারা পাশ করবে তাদের

জন্য নতুন একটি স্কুল-পরিত্যাগের পরীক্ষা প্রবর্তন করার প্রস্তাবও কমিটি করলেন। এ সব প্রস্তাব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাডো কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ নতুন ও পরিবর্তিত সংব্যাখ্যান দিলেন। তা-ছাড়া কমিটি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে গ্রামার, মডার্ন, সিনিয়র ক্লাশ, বা জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরগুলি সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলে পরিগণিত হবে। কোন শ্রেণীর স্কুলই অন্য স্কুলগুলির চেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে না।

হ্যাডো রিপোর্টের নির্দেশগুলি যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব-সূচক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯২৮ সালে শিক্ষা বোর্ড "শিক্ষার নতুন রূপ" (New Prospect in Education) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হ্যাডো পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সে সমস্যাগুলি এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে। সব চেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল বাড়ী নিয়ে। বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করতে হলে প্রয়োজন বহু নতুন বাড়ীর। অথচ সরকারের পক্ষে তেমন অর্থ সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠনের পরি-কল্পনা মন্থরগতিতে এগোতে লাগল। বিশেষ করে বেসরকারী স্কুলগুলির—যাদের স্কুল বাড়ীর নির্মাণ বা সংস্কারের ব্যাপারে সমস্ত ব্যয় নিজেদেরই করতে হয় তাদের পক্ষে মাধ্যমিক স্কুলের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করা বিশেষ শক্ত কাজ হয়ে পড়ল।

### শিক্ষা আইন—১৯৩৬ঃ

এই সমস্যার সমাধান করা হল ১৯৩৬'র শিক্ষা আইনের দ্বারা। নন্ প্রোভাইডেড স্কুলগুলিকে এই আইনের দ্বারা স্কুলবাড়ীর খরচার ৫০% পর্যন্ত দেওয়ার ক্ষমতা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের দেওয়া হল। এই ধরনের সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলগুলি এখন থেকে বিশেষ চুক্তির স্কুল (Special Agreement School) নামে পরিচিত হবে। এই নতুন শ্রেণীর স্কুলে সম্প্রদায়গত ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া হবে বিশেষভাবে নির্বাচিত শিক্ষকের দ্বারা। তাঁরা সাধারণত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হবেন অবশ্য স্কুলের পরিচালক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে। আবার যে সব পিতা মাতা চাইবেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই সব স্কুলে অসম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে।

## স্পেন্‌স্ রিপোর্ট—১৯৩৮ঃ

হ্যাডো রিপোর্টে প্রধানত মডার্ন স্কুল, সিনিয়র ক্লাশ এবং জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের গঠন ও পাঠক্রম নিয়ে আলোচিত হয়েছিল। গ্রামার স্কুল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। ১৯:৮ সালে স্যার উইল স্পেন্সের সভানেতৃত্বে আর একটি কমিটি গঠিত হয় এবং "মাধ্যমিক শিক্ষার উপর একটি বিবরণী" ( Report on Secondary Education ) প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে ১১+বয়স থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে যত রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই রিপোর্টে প্রচলিত গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। গ্রামার স্কুলগুলির পাঠক্রম এতদিন স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রয়োজনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। স্পেন্স্ রিপোর্টের মতে গ্রামার স্কুলের পাঠক্রম বহুমুখী হবে যাতে ছেলেমেয়েদের বিষয় নির্বাচনে অধিকতর স্বাধীনতা থাকে। পরীক্ষার পাঠক্রমের পরিমাণ কমাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, স্পেন্স কমিটি প্রস্তাব করলেন যে গ্রামার স্কুলের পাশাপাশি নতুন এক ধরনের মাধ্যমিক টেক্‌নিক্যাল স্কুল সৃষ্টি করা হবে। পূর্ব থেকে প্রচলিত জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলিতে ১৩ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা যোগ দিত এবং সেখানে দুই থেকে তিন বছরের জন্য শিক্ষালাভ করত। স্পেন্‌স্ কমিটি এই জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলিকে অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন। তবে পাঁচ বছরের পাঠস্তর-সম্পন্ন নতুন এক ধরনের মাধ্যমিক টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী যোগ দেবে ১১+এ এবং ছাড়বে ১৫ বছর বয়সে। জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সঙ্গে এই স্কুলগুলির যাতে গোলমাল না হয়ে যায় সেইজন্য স্পেন্‌স্ কমিটি এই নতুন স্কুলের নামাকরণ করলেন টেক্‌নিক্যাল হাই স্কুল।

কমিটি আরও নির্দেশ দিলেন যে প্রথম তিন বছরের ( ১১+ থেকে ১৩+ ) পাঠক্রম অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুলের ( গ্রামার ও মডার্ন ) পাঠক্রমের মোটামুটি অনুরূপ হবে। তবে ১৩+র পর থেকে পাঠক্রমে থাকবে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান এবং তার প্রয়োগ। যতদূর সম্ভব টেক্‌নিক্যাল হাই-স্কুল স্থাপিত হবে কোন টেক্‌নিক্যাল কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাতে তাদের

শিক্ষক ও সাজসরঞ্জামের সাহায্য পাওয়া যায়। টেক্‌নিক্যাল হাই স্কুলের জন্য নতুন স্কুল-পরিত্যাগের সার্টিফিকেটের প্রচলন করা হবে।

হ্যাডো রিপোর্টের সঙ্গে এক মত হয়ে স্পেন্‌স্‌ কমিটি বলেন যে গ্রামার মডার্ন ও টেক্‌নিক্যাল, এই তিন ধরনের মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা ও মূল্য সমান বলে বিবেচিত হবে। কমিটির মতে বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলির মধ্যে মর্যাদার সমতা রক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।

**নরউড রিপোর্ট—১৯৪১ঃ**

১৯৪১ সালে স্যার সিরিল নরউডের সভানেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে ছেলেমেয়েদের মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম, যারা তত্ত্ব বা জ্ঞানলাভে পটু; দ্বিতীয়, যারা বিজ্ঞান বা কলার প্রয়োগমূলক দিকটায় দক্ষ এবং তৃতীয়, যারা মূর্ত বস্তু নিয়ে সহজে কাজ করতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে স্পেন্‌স্‌ কমিটির মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রিবিধ ভাগকে মনের মধ্যে রেখে নরউড কমিটি ছেলেমেয়েদের ঐ তিন শ্রেণীর বিভাগের কথা বলেছেন এবং ঐ তিন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য তিনশ্রেণীর স্কুল ঠিক খাপ খেয়ে যায়। যেমন তত্ত্বপ্রিয় ছেলের জন্য সেকেণ্ডারী গ্রামার স্কুল, প্রয়োগপ্রিয় ছেলের জন্য টেক্‌নিক্যাল হাই স্কুল এবং মূর্তবস্তুতে দক্ষ ছেলের জন্য সেকেণ্ডারী মডার্ন স্কুল।

নরউড রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে তিন শ্রেণীর স্কুলের মধ্যে সর্বপ্রকার সমতা থাকবে। যতদূর সম্ভব এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে ছেলেমেয়েদের স্থানান্তরিত করা যাবে। কোন্‌ ছেলে কোন্‌ স্কুলের জন্য যোগ্য তা নির্ণীত হবে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বিচারের দ্বারা এবং সম্ভব হলে বুদ্ধির অভীক্ষা, সম্পাদনী অভীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োগের দ্বারা। পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীর পছন্দেরও যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিন রকম স্কুলেরই প্রথম তিন বছর প্রায় একই রকম পাঠক্রম থাকবে। স্পেন্‌স্‌ কমিটির রিপোর্টেও এই এক প্রস্তাব করা হয়েছিল।

সাধারণ ছেলেমেয়েদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা এবং সেই প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শ্রেণীর স্কুল গঠন করার পরিকল্পনাটি প্রথম দেন

হ্যাডো কমিটি। সেই পরিকল্পনাটিকে পূর্ণরূপ দেন স্পেন্‌স্ কমিটি এবং নরউড্ কমিটি।

কিন্তু এইভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক মনোবিজ্ঞানীই আপত্তি জানিয়েছেন। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী সিরিল বার্টের মতে ছেলেমেয়েদের শ্রেণীগত বিভাজন মনের বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী না করে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি অনুযায়ী করা উচিত। স্পেন্‌স্ কমিটি বা নরউড কমিটি যে শ্রেণীগত বিভাগের প্রস্তাব করেছেন সেটি স্পষ্টত ছেলেমেয়েদের বিশেষ মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী করা হয়েছে। অধিকতর মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং কার্যকরী শ্রেণীবিন্যাস হবে ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মান অনুযায়ী, তাদের বিশেষ ক্ষমতা যে শ্রেণীরই হোক না কেন।

নরউড রিপোর্ট পরীক্ষাগ্রহণ প্রথা সম্বন্ধেও কয়েকটি সুচিন্তিত প্রস্তাব করেন।

ইতিপূর্বে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। প্রথম প্রথম নানা ধরনের নানাস্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার প্রচলন ছিল। পরে এই বিভিন্ন পরীক্ষাগুলিকে সংশোধিত করে দুটি মাত্র পরীক্ষা রাখা হয়, প্রথম স্কুল পরীক্ষা, ১৬ বছরের বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এবং দ্বিতীয় স্কুল পরীক্ষা, ১৮ বছরের বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। নরউড কমিটি প্রথম স্কুল পরীক্ষাটিকে বহিরনুষ্ঠিত ( external ) পরীক্ষা না রেখে আভ্যন্তরীণ ( internal) পরীক্ষায় রূপান্তরিত করার পরামর্শ দেন এবং ১৮+ বৎসর বয়সে স্কুল পরিত্যাগের পরীক্ষাটি গ্রহণ করার প্রস্তাব করলেন। তবে প্রচলিত উচ্চতর পরীক্ষার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য হবে এই যে এতে শিক্ষার্থীর সমগ্র শিক্ষার পরিমাপ করা হবে না, কেবলমাত্র তার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতার বিচার করা হবে। সেইজন্য কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ে মাত্র শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে হবে।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিভোগী ছাত্রদের সরকারী অর্থসাহায্য এবং বৃত্তিদানের সময় পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির প্রবর্তন করারও নির্দেশ এই কমিটি দিয়েছিলেন।

**গ্রীন বুক—১৯৪১ ঃ**

১৯৩৯ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধে এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়। বোমার ভয়ে বড় বড় সহর খালি করে জনসাধারণ গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। ফলে ছেলেমেয়েরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয় এবং তাদের শিক্ষা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু এই সময়েই ইংলণ্ডের জননেতারা শিক্ষার সংস্কারের কথা চিন্তা করতে সুরু করেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে প্রতিমুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার মধ্যেও কেমন করে ইংলণ্ডের জননেতারা শিক্ষার কথা ভাবার সময় পেলেন। বোধকরি যুদ্ধের সর্ব-বিধ্বংসী ও ক্রুর মূর্তিকে সামনে দেখে জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করলেন। বস্তুত ইংলণ্ডের বড় বড় শিক্ষা আইনের অধিকাংশই কোন-না-কোন যুদ্ধের সময় পাশ হয়েছে। যেমন ১৮৭০'র আইন ফ্র্যাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময়, ১৯০২'র আইন বোর যুদ্ধের সময়, ১৯১৮'র আইন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং ১৯৪৪'র আইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

১৯৪১ সালে শিক্ষার নতুন পরিকল্পনার একটা ছক প্রকাশিত হয় 'গ্রীন বুক' নাম দিয়ে। এই পুস্তিকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সংঘ এবং অন্যান্য শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, শিক্ষাবোর্ডের নানা আলোচনা লিপিবদ্ধ ছিল। এতে স্কুল-পরিত্যাগের বয়সবৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন সংজ্ঞা দান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন, অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, নার্সারি স্কুল স্থাপন, শিক্ষকদের নির্বাচন, শিক্ষণ পদ্ধতি ও বেতন ইত্যাদি শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ ছিল।

**শ্বেতপত্র—১৯৪৩ ঃ**

এই আলোচনার ফলরূপে ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট "শিক্ষামূলক পুনর্গঠন" ( Educational Reconstruction ) নামে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। এর মূল বক্তব্য ছিল যে রাষ্ট্র-স্বীকৃত জনশিক্ষার তিনটি পর পর স্তর থাকবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষা। বলা বাহুল্য হ্যাডো রিপোর্টের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই এই নতুন পরিকল্পনাটি গঠন করা হয়েছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা

থাকবে। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলিকে এই নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে হবে। স্কুল পরিত্যাগের বয়স বিনা ব্যতিক্রমে সর্বত্রই পনেরোতে ওঠান হবে, পরে ষোলতে। সমস্ত রাষ্ট্র-পালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই বেতন উঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি কর্মে নিযুক্ত ছেলেমেয়েদের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে কিছুক্ষণের জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে। যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে নার্সারি স্কুল স্থাপন করা হবে। জুনিয়র স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুলে যাবার পথে যে সব বিশেষ ধরনের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এবং যার ফলে জুনিয়র স্কুলগুলিকে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হত সেগুলি তুলে দেওয়া হবে। এই শ্বেতপত্রে কারিগরী শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা, যুব-সেবা, শিক্ষকদের শিক্ষণ ও নির্বাচন প্রথার সংস্কার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছিল।

এই শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই পরম আদরে গৃহীত হল। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ বাটলার এই শ্বেতপত্রের উপর নির্ভর করেই ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আইনটির বিল উপস্থাপিত করেন। ১৯৪৪ সালের আগষ্টে এই বিলটি আইনে পরিণত হয়। সমস্ত শিক্ষাবিদগণের মতেই এই শিক্ষা আইনটি ইংলণ্ডের শিক্ষা-বিবর্তনের ইতিহাসে যথার্থ যুগান্তর এনেছে।

**শিক্ষা আইন—১৯৪৪ঃ**

এই আইনটি ইংলণ্ডের সর্ববিধ শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিবর্তন এনেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে সব পরিকল্পনা হ্যাডো রিপোর্ট, স্পেন্স্ রিপোর্ট, নরউড রিপোর্ট, গ্রীন বুক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলির একটি সুষম বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে এই আইনের মাধ্যমে।

এই আইনের দ্বারা পুরাতন শিক্ষাবোর্ড তুলে দিয়ে শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হল নব গঠিত শিক্ষার মন্ত্রীদপ্তরের হাতে। শিক্ষামন্ত্রীদের সাহায্য করবার জন্য থাকবে একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী, অন্যান্য কর্মচারী, দুটি উপদেষ্টা সমিতি ইত্যাদি। শিক্ষা-পরিদর্শক নিযুক্ত করাও শিক্ষামন্ত্রীর অন্যতম কাজ।

স্থানীয় পরিশাসনের ভার রইল কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো

কাউন্সিলের হাতে। এরাই স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বা এল-ই-এ বলে পরিচিত হবে। প্রত্যেক এল-ই-এ'র সঙ্গে থাকবে একটা করে শিক্ষা কমিটি যার সঙ্গে আলোচনা করে এল-ই-এ সমস্ত কাজ করবে। এল-ই-এ'র শাসনাধীন অঞ্চলগুলির যথাযথ বিভাজন করার জন্য প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক কার্য-নির্বাহক সংস্থা ( Divisional Executive ) গঠন করা হবে। কোন কোন জেলা এই আঞ্চলিক পরিশাসনের বাইরে থাকতে পারে। সেগুলিকে ব্যতিক্রমমূলক জেলা ( Excepted District ) বলা হয়। প্রত্যেক এল-ই-এ একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রধান শিক্ষা-আধিকারিক ( Chief Education Officer ) নিযুক্ত করবে।

এই আইনে শিক্ষার তিনটি সুনির্দিষ্ট পাঠস্তর নির্দেশ করে দেওয়া হল যথা—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর। মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝাবে ১২ থেকে ১৯ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে। ১৯৪৮ সালের শিক্ষা আইনে অবশ্য নীচের দিকে ১০½ বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকেও মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকবে। প্রত্যেক অঞ্চলে বিদ্যালয় পর্যাপ্ত যেন হয়। পর্যাপ্ত বলতে কেবল সংখ্যার দিক দিয়ে পর্যাপ্ত নয়—প্রকৃতি, সাজসরঞ্জাম, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সবদিক দিয়েই বিদ্যালয়গুলি পর্যাপ্ত হবে।

স্কুলগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হল। কাউন্টি স্কুল, যেগুলি এল-ই-এ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত; এবং স্বাধীন বা ভলাণ্টারি স্কুল, যেগুলি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। ভলাণ্টারি স্কুলগুলিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হল যথা—সাহায্যপ্রাপ্ত (aided), বিশেষ চুক্তিসম্পন্ন (Special Agreement) এবং নিয়ন্ত্রিত ( Controlled )। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে শিক্ষামন্ত্রী স্কুলবাড়ী সংস্কার সাধনের জন্য মোট ব্যয়ের অর্ধেক দিয়ে থাকেন। বিশেষ চুক্তির স্কুলগুলিকে স্কুলবাড়ী সংস্কারের জন্য মোট ব্যয়ের তিন চতুর্থাংশ দিয়ে থাকেন। নিয়ন্ত্রিত স্কুলের সমুদয় ব্যয় বহন করে এল-ই-এ।

কাউণ্টি মাধ্যমিক স্কুলগুলির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত করে এল-ই-এ। ভলাণ্টারি মাধ্যমিক স্কুলগুলির পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন শিক্ষামন্ত্রী

এল-ই-এ'র সঙ্গে পরামর্শ করে। স্কুলটি সাহায্যপ্রাপ্ত বা বিশেষচুক্তির স্কুল হলে, পরিচালকমণ্ডলীর দুই তৃতীয়াংশ এবং নিয়ন্ত্রিত হলে পরিচালকমণ্ডলীর এক তৃতীয়াংশ স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘ দ্বারা নির্বাচিত হবে। কাউণ্টি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার এল-ই-এ'র হাতে। কিন্তু ভলাণ্টারি স্কুলগুলিতে ধর্মমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাতা সংস্থাটির অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

১৯৪৪'র আইন অনুযায়ী সমস্ত স্কুলে ধর্মমূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এল-ই-এ পরিচালিত স্কুলগুলিতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়মূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়না। বিশেষ একটি সর্বজন অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। ভলাণ্টারি স্কুলগুলিতে সম্প্রদায়-মূলক ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলবে। যদি কোন অভিভাবক ইচ্ছা করেন তবে তিনি শিক্ষার্থীকে ঐ ধর্ম শিক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারেন কিংবা অন্য কোথাও অন্য সম্প্রদায়মূলক ধর্ম শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করতে পারেন।

১৯৪৪'র আইন অনুযায়ী ৫ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ১৯৪৬'র আইনে ১৪ বছর থেকে ১৫ বছর করা হয়েছে এবং বলা হল ভবিষ্যতে যত শীঘ্র সম্ভব এটিকে ১৬ বছরে পরিণত করা হবে। এল-ই-এ পরিচালিত স্কুলে শিক্ষা অবৈতনিক হবে।

প্রত্যেক এল-ই-এ তার পরিচালিত স্কুলগুলির ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

১৯৪৪'র আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছাত্র পূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ পাবে। তাছাড়া এল-ই-এ নিজেদের পরিচালিত স্কুলগুলির ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ, খাদ্য এবং অন্যান্য জলখাবারেরও ব্যবস্থা করবে। এমন কি দরকার হলে এল-ই-এ ছেলেমেয়েদের পোষাকও সরবরাহ করবে।

চিত্তবিনোদন এবং সামাজিক ও শারীরিক শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধার ব্যবস্থা করাও এল-ই-এ'র কর্মসূচীর অন্তর্গত। এর জন্য ক্যাম্প, ছুটীর দিনে ক্লাস, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, স্নানাগার, যুবসংগঠন ইত্যাদির ব্যবস্থাও এল-ই-এ'কে করতে হবে।

স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে যোগদানের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহনের ব্যবস্থাও এল-ই-এ করবে। যদি দু'তিন মাইলের মধ্যে স্কুল না থাকে তবে শিক্ষার্থীকে স্কুলে পৌছে দেবার দায়িত্ব এল-ই-এ'র।

ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে নানা আইনের সাহায্যে শিশুদের কাজে নিয়োগ করা নিয়ন্ত্রিত বা বন্ধ করা হয়েছে। ১৯৪৪'র আইনে স্কুল পরিত্যাগের বয়সকে ১৫তে তুলে দেওয়ায় বর্তমানে শিশু কথাটির সংজ্ঞাই বদলে গেল। অর্থাৎ ১৫ বছর ( পরে ১৬ বছর ) বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অর্থকরী কাজে নিযুক্ত করবার অধিকার অভিভাবকদের আর রইল না।

যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য ব্যয় বহন করা, স্কুলের বেতন বা অন্যান্য ব্যয় মেটান, বৃত্তি এবং অর্থ সাহায্য দেওয়া ইত্যাদিও এল-ই-এ'র কর্মসূচীর অন্তর্গত হল।

শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে যে সব ব্যয় হবে তার জন্য শিক্ষামন্ত্রী এল-ই-এ'কে অর্থ সাহায্য করেন। তাছাড়া স্বাধীন শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি ও শিক্ষার্থীরাও সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এল-ই-এ'কে শিক্ষামন্ত্রী কত টাকা দেবে তা নির্ধারিত হয় সাহায্যদানের নীতি ( Grant formula) দ্বারা। ১৯৩৮-৩৯ সালে এল-ই-এ'র মোট ব্যয়ের ৪৯.৩৬% শিক্ষামন্ত্রী দিতেন। ১৯৪৪'র আইন পাশের পর মোট ব্যয়ের ৫৪'৩৬% দিয়ে থাকেন। এই সাহায্যদানের নীতি তিনটি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে—প্রথম ছাত্রসংখ্যা, দ্বিতীয় মোট ব্যয়ের পরিমাণ এবং তৃতীয় শিক্ষা-করের মানের দিক দিয়ে বিশেষ একটি এল-ই-এ'র ব্যয় করার ক্ষমতা।

এই আইন অনুযায়ী স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য পর্যাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। পর্যাপ্ত বিদ্যালয় বলতে বোঝাবে এমন বিদ্যালয় যেখানে সমস্ত শিক্ষাথা তাদের বয়স, সামর্থ্য, দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারবে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু আইনে বলা হয়নি।

কিন্তু হ্যাডো, স্পেন্স্ ও নরউড্ রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় হল, গ্রামার স্কুল, মডার্ন স্কুল ও টেক্‌নিক্যাল হাই স্কুল। ১৯৪৪ সালের আইনের কোথাও এ তিন শ্রেণীর স্কুলের নাম নেই কিন্তু

পর্যাপ্ত বিদ্যালয় বলতে আইন প্রণয়নকারীরাও যে এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়কে বোঝাচ্ছেন এ কথাটা একরকম ধরে নেওয়া হল।

**শিক্ষাদপ্তরের পুস্তিকা—১৯৪৭ঃ**

১৯৪৭ সালে শিক্ষাদপ্তর থেকে নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা ( New Secondary Education ) নামে একটি বিভাগীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতেও মাধ্যমিক শিক্ষার এই ত্রি-ধারার সমর্থন করা হয়। এই সরকারী পুস্তিকাটিতে ধরে নেওয়া হয় যে ছেলেমেয়েদের তিনটি মনোবিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং এই তিন প্রকারের স্কুল এই তিন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ঠিক উপযোগী। এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মূর্ত বস্তু ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সব কিছু শেখে এবং তাদের শিক্ষা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের জন্য মডার্ন স্কুলের শিক্ষাই উপযোগী। আর একদল ছেলেমেয়ে অমূর্ত চিন্তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ করতে সমর্থ, এবং তাদের উপযোগী হল গ্রামার স্কুলের শিক্ষা। আর যারা শিল্প-কৃষি ইত্যাদি বিষয়কেই নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তিরূপে নির্বাচন করে নেবে, তাদের জন্য হল মাধ্যমিক কারিগরী বিদ্যালয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার এই ত্রি-ধারায় বিভাজনের অনেকেই সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, ছেলেমেয়েদের এই তিনটি আনুমানিক শ্রেণীতে বিভাগ করা মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে বর্ণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর পশ্চাতে মনোবিজ্ঞানের কোন সমর্থন নেই। দ্বিতীয়ত, অনেকের মতে নিছক পরিশাসনের সুবিধার জন্য এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে স্কুলকে না গড়ে, স্কুলের উপযোগী করে শিক্ষার্থী গড়া হচ্ছে। তৃতীয়ত, সামাজিক মর্যাদা এবং বৃত্তিঘটিত সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে মডার্ন স্কুল গ্রামার স্কুলের চেয়ে অনেক হেয়। যারা গ্রামার স্কুল থেকে পাশ করে তারা যেমন উচ্চ সামাজিক মর্যাদা পায় তেমনই বহুবিধ সাহিত্যধর্মী বৃত্তিতে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু মডার্ন স্কুলের এসব কোন গুণই নেই। অতএব শিক্ষাঘটিত ক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তা এখানে পাওয়া যায় না। তার ফলে ছেলেমেয়েরা গ্রামার স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় ভাল ফল করার দুশ্চিন্তায় নিতান্ত অস্বাভাবিকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এক কথায় এই সব সমালোচকদের মতে ১১+এ কোনরূপ শিক্ষামূলক নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই যুক্তি থেকেই নতুন এক ধরনের স্কুলের পরিকল্পনা জন্মলাভ করেছে। তার নাম হল বহুসাধক (Multilateral) বা সর্বব্যাপক ( Comprehensive ) বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে সব রকমের ছেলেমেয়েদেরই নেওয়া হয় এবং স্কুলের মধ্যেই তাদের বিভিন্ন বিভাগ বা ধারায় শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এই ধরনের স্কুলের সমর্থক থাকলেও এগুলি এখনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ১৯৫২ সালের একটা হিসেবে দেখা যায় যে আংশিক বা পূর্ণ বহুসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৬৯, আর গ্রামার, টেকনিক্যাল ও মডার্ন মিলিয়ে ৪৮৪৫।

১৯৪৪ সালের সবগুলি সর্তই তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। সর্বজনীন অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষার সর্তগুলি ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী করা হয়নি, যদিও তাই নির্দেশ ছিল। তাছাড়া এমন অনেকগুলি ধারা আছে ( যেমন কাউন্টি কলেজ স্থাপনার নির্দেশ ) যেগুলি এখনও পর্যন্ত বাস্তবে রূপ পায়নি।

এই আইনের নির্দেশ ছিল যে ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে স্কুল-শিক্ষার ঊর্ধ্ব বয়সসীমা ১৫তে তোলা হবে। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। এই বয়স-সীমাকে ১৪ থেকে ১৫তে তোলার অর্থ হল প্রায় ৩৯১,০০০ অতিরিক্ত স্কুল সীট্ লাগবে, ১৬তে তোলার অর্থ হল আরও ৪০৬,০০০ অতিরিক্ত স্কুল সীট্ লাগবে। কিন্তু বাড়ী এবং শিক্ষক উভয়েরই যথেষ্ট অভাব ছিল। তাছাড়া শত্রু-আক্রমণে প্রায় ১৫০,০০০ স্কুল সীট্ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সেইজন্য ১৯৪৭ সালের আগে স্কুল ত্যাগের বয়স ১৫তে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৫ থেকে ১৬তে তোলার পরিকল্পনাটি উপস্থিত স্থগিত রয়েছে। ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে দু'পাঁচ বছরের মধ্যে বয়সের ঊর্ধ্বসীমাকে আর উপরে তোলা যাবে না। বিশেষ করে সুয়েজ ক্যানাল ঘটিত সাম্প্রতিক গোলোযোগের জন্য শিক্ষা-বয়সের ঊর্ধ্ব সীমা বাড়ানো বা কাউন্টি কলেজ খোলা কোনটিই অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

১৯০২ সালের আইনে তিন শ্রেণীর এল-ই-এ ছিল। যাদের 'পার্টথ্রি' কর্তৃপক্ষ বলা হত তাদের এই আইনের দ্বারা উঠিয়ে দেওয়া হল। এখন এল-ই-এ বলতে রইল কাউন্টি কাউন্সিল ও কাউন্টি বারো কাউন্সিল। ফলে ৩১৫টি এল-ই-এ'র জায়গায় দাঁড়াল মাত্র ১৪৬টি এল-ই-এ।

১৯২১ সালের আইন অনুযায়ী কোন স্বাধীন স্কুলে যদি কোন ছেলে পড়ত এবং যদি সেই স্কুল পরিদর্শন করার অধিকার এল-ই-এ'র না থাকত তবে সেই ছেলের অভিভাবককে এল-ই-এ কোর্টে এই বলে অভিযুক্ত করতে পারতেন যে তিনি তাঁর ছেলের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন না। কিন্তু সরাসরি এই স্কুলের বিরুদ্ধে এল-ই-এ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন না। পদ্ধতিটি এতই জটিল ছিল যে অযোগ্য বা অনুপযুক্ত স্বাধীন স্কুলগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হত না।

১৯৪৪'র আইনের ফলে শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত স্বাধীন স্কুলগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রত্যেকটি স্বাধীন স্কুলের নিজস্ব দায়িত্ব হল নিজের নামটি সেই তালিকাভুক্ত করা। এই তালিকাভুক্ত করার নিয়মকানুনগুলি শিক্ষা-মন্ত্রীই অবশ্য নির্ধারিত করে দেবেন। যে স্বাধীন স্কুলের নাম এই তালিকাভুক্ত নয় সেই স্কুলের পরিচালক আইনের চোখে অপরাধী। অবশ্য প্রয়োজন হলে যে কোন স্বাধীন স্কুলের মালিক স্বাধীন স্কুলের বিচারকমণ্ডলীর ( Independent School Tribunal ) নিকট তার কোন অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারেন। এর ফলে এল-ই-এ'র কাছে অবাঞ্ছিত স্বাধীন স্কুলগুলির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হবে না।

শিক্ষামন্ত্রী ১৯৪৫-৪৬ সালে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদানের নিয়ম তৈরী করলেন। যথা, প্রধান সাহায্য, অতিরিক্ত সাহায্য, শিক্ষক-শিক্ষণের কলেজের জন্য দান, জরুরী শিক্ষক-শিক্ষণের সাহায্য ও বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থলগুলি অপসারণের জন্য সাহায্য।

১৯৪৪ সালের আইনের কিছু কিছু সংশোধন করা হয়েছে পরবর্তী অনেক-গুলি আইনের দ্বারা। তাছাড়া বহু বিভাগীয় নিয়মকানুন, শিক্ষাদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে এর শিক্ষানীতিটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

### শিক্ষা আইন—১৯৪৬ :

১৯৪৪ সালের পর প্রথম আইন পাশ হয় ১৯৪৬ সালের ২২শে মে। এর সপ্তম ধারায় আছে যে, কাউন্টি ও ভলাণ্টারি স্কুলগুলিতে দিনের কাজের সুরুতে যে সম্মিলিত প্রার্থনাটি হয় সেটি অবশ্যই স্কুলের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হবে।

### শিক্ষা ( নানাবিধ ব্যবস্থা ) আইন,—১৯৪৮ :

১৯৪৮ সালে আর একটি শিক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা

১৯০৪'র আইনটির কতকগুলি ধারা বদলান হয়। ১৯৪৮'র শিক্ষা আইনটির তৃতীয় ধারাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে যে নীচের দিকে ১০½ বছর বয়স থেকে সমস্ত ছেলেমেয়ের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলে গণ্য করতে হবে। ইতিপূর্বে এই মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের নিম্ন রেখা ১২তে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা হল ১০½ বছরের নীচের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

**শিক্ষা ( নানাবিধ ব্যবস্থা ) আইন—১৯৫৩ঃ**

১৯৫৩ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা বিপথগামী ছেলেমেয়েদের সরাসরি কিশোর বিচারালয়ে ( Juvenile Court) হাজির করার ক্ষমতা এল-ই-এ'কে দেওয়া হয়েছে।

বহু বিভাগীয় নিয়মকানুনের মধ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪শে মার্চের ৩৪৫নং নিয়মটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর স্কুলবাড়ী কেমন হবে তার যথার্থ মান নিরূপিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য এই মান পুরোপুরি অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেই জন্য ১৯৫০ সালে শিক্ষাদপ্তর স্কুলবাড়ী সম্বন্ধে আইনগুলির কিছু সংশোধন করেন। ১৯৫২ সালের ২৪৫ নং বিজ্ঞপ্তির দ্বারাও মালমসলার তীব্র অভাবের জন্য বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনাকে সঙ্কুচিত করতে হয়েছে। পুরানো সেকেলে স্কুলবাড়ী-গুলো ভেঙ্গে নতুন বাড়ী গড়ার পরিকল্পনাটি বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে।

যোগ্য শিক্ষক পাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এর জন্য এক বছরের শিক্ষণ-ব্যবস্থা-সম্পন্ন জরুরী ( emergency ) শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৪ সালের ম্যাকনেয়ার কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট অফ্ এডুকেশান ( University Institute of Education ) গঠন করা হয়। শিক্ষকদের বেতনের হার পরিবর্তিত করা হয় এবং শিল্পকলা ইত্যাদি বৃত্তিতে যে বেতন পাওয়া যায় তার সঙ্গে শিক্ষকদের বেতনের কোন পার্থক্য না থাকায় ১৯৫৭-৫৮ সালে দেখা গেল শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগে প্রবেশ-কামীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা সমিতি ( Secondary School Examination Council ) ১৯৪৭ সালে নির্দেশ দিলেন যে ১৬ বৎসর বয়সের মাথায়

সাধারণ ও উন্নতস্তরের উপযোগী একটি বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়গুলিই ঐচ্ছিক পর্যায়ে থাকবে এবং আগেকার মত বিষয়গুলিকে গ্রুপ বা গুচ্ছে বিভক্ত করার প্রথা আর থাকবে না। অর্থাৎ পরীক্ষার্থী যে কোনও বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে, যে কোন বিষয় বাদ দিতেও পারবে। এই পরীক্ষা দেবার সর্বনিম্ন বয়স নিয়ে বেশ বিতর্ক দেখা দিয়েছিল।

## ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রিধারা

১৯২৬ সালে হ্যাডো কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় রাখার প্রস্তাব করেন। প্রথম, গ্রামার, প্রচলিত মাধ্যমিক স্কুলগুলির অনুরূপ; দ্বিতীয় মডার্ন, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত নতুন ধরনের স্কুলগুলি এবং সেই সঙ্গে বলেন যে ১৩ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে পাঠগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে। স্পেনস্ কমিটি এই পরিকল্পনাটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রামার ও মডার্নের সঙ্গে জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলের জায়গায় টেকনিক্যাল হাই স্কুল নামে আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল স্থাপনার, নির্দেশ দিলেন। ১৯৪৩ সালে নরউড কমিটি এই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন জানালেন এবং ১৯৪৪ সালের আইনে যদিও এই ত্রিবিধ স্কুলের কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবু এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে মাধ্যমিক স্কুলের এই ত্রিধারা এই আইনটির দ্বারাও সমর্থিত। এই তিন প্রকার স্কুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

**গ্রামার স্কুল ( Grammar School ):**

ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুল কথাটির সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের একটা মর্যাদা ও গৌরব জড়িয়ে আছে। শোনা যায়, প্রথম গ্রামার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যাণ্টারবারীতে ৫৯৭ বা ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে। এর পর ইয়র্ক, উইনচেষ্টার, ওরসেস্টার, লিচ্‌ফিল্ড, হারফোর্ড ইত্যাদি স্থানে গ্রামার স্কুল স্থাপিত হল। গ্রামার স্কুলের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় যাজক এবং অভিজাতদের ল্যাটিন ভাষা শেখান, যাতে তাঁরা খৃষ্টীয় উপদেশাবলী বুঝতে পারেন। বর্তমানে গ্রামার স্কুল বললে কিন্তু এই ধরনের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসম্পন্ন স্কুলগুলিকে আর বোঝায় না। ১৯০২ সালের আইনের বলে এল-ই-এ যে নতুন মাধ্যমিক স্কুলগুলি স্থাপন করে সেগুলিকেই বর্তমানে গ্রামার স্কুল বলতে বোঝায়। প্রাচীন এবং প্রকৃত গ্রামার স্কুলগুলি এখনও নতুন গ্রামার স্কুলের পাশাপাশি রয়েছে। সেগুলি বর্তমানে এল-ই-এ'র সাহায্য পায় বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের স্বাধীন সত্তা তারা কিছু পরিমাণে বজায় রেখেছে। কতকগুলি বহুদিনের

প্রসিদ্ধ গ্রামার স্কুল বর্তমানে গ্রামার স্কুল নামটি পরিত্যাগ করে পাব্লিক স্কুল নামে নিজেদের পরিচিত করে থাকে।

'গ্রামার' কথাটি আজকে একটি বিশেষ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়া আর বেশী কিছু বোঝায় না। শিক্ষাদপ্তরের ভাষায় যে সব স্কুলে বিশেষভাবে সাহিত্য-ধর্মী বা বিজ্ঞান-ধর্মী পাঠক্রম অনুসরণ করা হবে সেগুলিকেই গ্রামার স্কুল বলা হবে। তবে একথা সত্য যে পুরাতন গ্রামার স্কুলের সঙ্গে আধুনিক গ্রামার স্কুলগুলির একটা প্রকৃতিগত যোগসূত্র আছে।

আধুনিকই হোক বা পুরাতন হোক সব গ্রামার স্কুলেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সমস্ত গ্রামার স্কুলেরই লক্ষ্য হল তাদের ভাল ভাল ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। তাদের শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে থেকে। গ্রামার স্কুলের তিন চতুর্থাংশের উপর শিক্ষকই হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এবং চার-পঞ্চমাংশই অন্তত এক বছর করে শিক্ষণপ্রাপ্ত। অনেক গ্রামার স্কুলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষক শিক্ষিকাও আছেন। তবে গ্রামার স্কুলে শিক্ষক-বেতনের হার মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তার ফলেই বোধ হয় অতীতের তুলনায় শিক্ষক-বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এমন উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা দিন দিন কমার পথে।

অন্যান্য সেকেণ্ডারী স্কুলের মত গ্রামার স্কুলেরও ক্লাশে অনুমোদিত সর্বোচ্চ ছাত্র-সংখ্যা হল ৩০, যদিও বহুক্ষেত্রে এ সংখ্যাকে অতিক্রম করা হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ যে ক্লাশের এই বর্ধিত আয়তন সম্বন্ধে উদাসীন তা নয়, তবে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই এর কারণ হওয়াতে সহজে এ সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। গত ১৯৪৭'র ১লা এপ্রিল থেকে স্কুল-বয়স ১৪ থেকে ১৫তে তোলার ফলে এক বছরের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কম করে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার বেড়ে যায়। তাছাড়া যুদ্ধের পর জন্মের হারও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে বহু স্কুল ক্লাশে ৩০ জনের বেশী করে ছাত্রছাত্রী নিতে বাধ্য হয়। এই একই কারণে মাধ্যমিক স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারও প্রচুর অভাব দেখা দিয়েছে।

গ্রামার স্কুলের সনাতন লক্ষ্য ছিল উদারধর্মী ( liberal ) শিক্ষা দেওয়া। উদারধর্মী শিক্ষার ধারণাটি এসেছে গ্রীকদের কাছ থেকে। আরিষ্টটলের মতে

উদারধর্মী শিক্ষা বললে বোঝায় সেই সব শিক্ষা যা মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে না। যে সব বিদ্যার সাহায্যে জীবিকা অর্জন করা যায় সেগুলি উদারধর্মী শিক্ষার অন্তর্গত নয়। গ্রীক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উদারধর্মী বিদ্যা সাতরকম। তার মধ্যে ব্যাকরণ (Grammar), অলঙ্কার (Rhetoric), তর্কবিদ্যা ( Logic ) এই তিনটিকে গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুলগুলিতে কেবল মাত্র পড়ানো হত ল্যাটিন সাহিত্য এবং ল্যাটিন ব্যাকরণ। কোন কোন স্কুলে গ্রীকসাহিত্যও পড়ানো হত।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলে এসেছিল। উইন-চেষ্টার স্কুলের প্রসিদ্ধ প্রধানশিক্ষক টমাস আর্নল্ড প্রথমে গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমের পরিসংস্কার করেন। তিনি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলেন মাতৃভাষা, প্রাথমিক ল্যাটিন, প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষাগুলি, ইতিহাস, গণিত, জ্যামিতি ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বাদি। ১৯০৪ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মকানুনের ( Regulations for Secondary Schools ) মাধ্যমে গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমের আর এক দফা সংস্কার করা হয়, যথা, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল, ইংরাজী ছাড়া অন্তত একটি ভাষা, অঙ্ক এবং বিজ্ঞান, অঙ্কন। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং ছেলে-মেয়ে সকলের জন্যই কিছুটা হাতের কাজ এবং শরীর চর্চা।

গ্রামার স্কুলের শিক্ষা কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠ্য বিষয় পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর সর্বমুখী বিকাশকেই গ্রামার স্কুলের শিক্ষার লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। স্পেন্‌স্ কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে গ্রামার স্কুলের কাজ হল প্রাপ্তযৌবনদের এমন সকল অভিজ্ঞতা দেওয়া যার ফলে তাদের বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয়। এই জন্য গ্রামার স্কুলের শিক্ষা বই পড়া বা লেকচার শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সে শিক্ষা বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের আদর্শ জীবন গড়ে তোলার বিস্তৃত পরিকল্পনায় পরিব্যাপ্ত। ক্লাশে পড়াশোনা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল সমিতি, বিতর্ক, অভিনয়, প্রাকৃতিক ইতিহাস, ছবি তোলা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, সম্মিলিত সংগঠন ইত্যাদি বহু শিক্ষামূলক মাধ্যমের সাহায্যে গ্রামার স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রামার স্কুলের আরও একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে

অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ে উচ্চধীসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয় তাদের ষষ্ঠ ফর্ম ( Form ) বা শ্রেণীতে উচ্চস্তরের শিক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন উন্নত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

**মডার্ন স্কুল ( Modern School ) ঃ**

ইংলণ্ডে প্রচলিত মাধ্যমিক স্কুলগুলির মধ্যে বর্তমানে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী হল মাধ্যমিক মডার্ন স্কুল। ১১ বৎসরের বেশী ছেলেমেয়েদের বেশ একটা বড় অংশ পড়ে মডার্ন স্কুলে। আমরা দেখেছি যে উনবিংশ শতাব্দীতে বহু প্রাথমিক স্কুলের সংগে সংযুক্ত ছিল উন্নত ক্লাশ যেখানে প্রকৃত পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাই দেওয়া হত। এইগুলি পরে "সেণ্ট্রাল স্কুল" বা "সিনিয়র ক্লাস" নামে পরিচিত হয়েছিল। পরে এগুলিকেই 'মডার্ন' নাম দেওয়া হয়, সেই থেকে এ নামই থেকে গেছে। অতএব আমরা বলতে পারি যে অতীতের সিনিয়র বা সেণ্ট্রাল বা উন্নত শ্রেণীর প্রাথমিক স্কুল থেকেই বর্তমানের মডার্ন স্কুলগুলি সৃষ্ট হয়েছে।

মডার্ন স্কুলের সৃষ্টি ইংলণ্ডের শিক্ষার প্রচলিত আদর্শ ও পরিকল্পনার মধ্যে নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছিল। প্রচলিত গ্রামার স্কুল ছিল মুষ্টি-মেয়দের জন্য তাদের বিশেষ শক্তি সামর্থ্যকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। কিন্তু মডার্ন স্কুলের পরিকল্পনা হল সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্য এবং এর শিক্ষার সূচীও গ্রামার স্কুলের সূচী থেকে বেশ বিভিন্ন।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে মোট মডার্ন স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩,৪২৩ এবং তাতে যোগ দিত ১,১৩৫,৬৬৯ ছাত্রছাত্রী। ঐ বৎসরই গ্রামার স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১৮৪ এবং সেগুলির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫১২,৬১৩—অর্থাৎ মডার্ন স্কুল ও গ্রামার স্কুলের মধ্যে অনুপাত হল ৩ ঃ ১। মডার্ন স্কুল ও মাধ্যমিক টেকনিক্যাল স্কুলের সঙ্গে অনুপাত হল ১০ ঃ ১। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ইংলণ্ডে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক স্কুল হল মডার্ন স্কুল এবং সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীও পড়ে মডার্ন স্কুলে। কেবল তাই নয়, বর্তমান মডার্ন-স্কুলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় এবং ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে স্থান দেবার জন্য প্রতি বৎসরই এই সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিযুক্ত করার রীতি ছিল না। শিক্ষকবৃত্তিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত করার রীতিই প্রচলিত

ছিল। ফলে মডার্ন স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও গ্রাজুয়েট শিক্ষক ছিল না বললেই চলে। তবে বর্তমানে মডার্ন স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে এবং বর্তমানে মডার্ন স্কুলের শিক্ষকদের শতকরা ১৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। তবে মডার্ন স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষণ প্রাপ্ত।

গ্রামার স্কুলের মত মডার্ন স্কুলের ক্লাশের অনুমোদিত সর্বোচ্চ সংখ্যা হল ৪০, কিন্তু গ্রামার স্কুলের মত মডার্ন স্কুলেও এমন অনেক ক্লাশ আছে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ৫০তে উঠেছে। স্কুল পরিত্যাগের বয়স বাড়ানোর প্রতিক্রিয়া বেশীর ভাগটাই সহ্য করতে হয়েছে মডার্ন স্কুলকে।

মডার্ন স্কুলের স্থষ্টি সমাজের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য। শিক্ষাদপ্তরের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে মূর্ত বস্তু নাড়াচাড়া করে এবং তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে মডার্ন স্কুলের পাঠক্রম প্রাথমিক স্কুলের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ফলে মডার্ন স্কুলগুলির মধ্যে প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রচুর বৈষম্য ও পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এমন অনেক মডার্ন স্কুল আছে যেগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আবার আর একশ্রেণীর মডার্ন স্কুল আছে যারা নানা দিক দিয়ে গ্রামার স্কুলেরই পাঠক্রম অনুসরণ করে থাকে। তবে অধিকাংশ মডার্ন স্কুলই প্রয়োগ মূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেছে এবং বিজ্ঞান ঘর, শিল্প-ঘর, বাগান ইত্যাদির প্রবর্তন করে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা দেবার আয়োজন করে। এ ছাড়া আরও একশ্রেণীর মডার্ন স্কুল দেখা যায় যারা একেবারে গতানুগতিক শিক্ষণ পন্থা পরিত্যাগ করে নিছক কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে। এগুলির কোন কোনটিতে সুফল ফললেও অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত পরিকল্পনাটিই আতিশয্য দোষে দুষ্ট হওয়ায় প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

**টেকনিক্যাল স্কুল ( Technical School ) :**

বিংশশতকের প্রথম থেকেই ইংলেণ্ড "ডে ট্রেড্ স্কুল" ( Day Trade School ) নামে এক ধরনের স্কুলের প্রচলন ছিল। যে সব ছেলেমেয়েরা

প্রথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের কোন বিশেষ শিল্পে দক্ষতা দান করাই এই ডে স্কুলগুলির উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম প্রথম শিক্ষাবোর্ড এদের কোনরূপ সাহায্য করতেন না। কিন্তু ১৯০৫ সাল থেকে এদের অর্থসাহায্য দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। ১৯১৩ সালে শিক্ষাবোর্ড এই সব স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র এক দফা আইনকানুন তৈরী করলেন এবং এদের অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হল। এই সময় থেকেই এদের অধিকাংশই জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল ( Junior Technical School ) নামে পরিচিত হল। ১৯৩৭ সালে যখন স্পেন্‌স্ কমিটি গঠিত হয়। তখন ইংলণ্ডে বিভিন্ন পাঠক্রম সম্বলিত এবং বিভিন্ন প্রকৃতির বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ছিল। ছেলেদের জন্য জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, যেখানে সাধারণভাবে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হত; মেয়েদের জন্য জুনিয়র হাউস ওয়াইফ্‌রি স্কুল, যেখানে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম শেখান হত; জুনিয়র কমার্সিয়াল স্কুল, যেখানে হিসাব-রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ, কেরাণী, টেলিফোন অপারেটর ইত্যাদি চাকুরীর জন্য শিক্ষা দেওয়া হত; জুনিয়র আর্ট স্কুল যেখানে চারুকলা শিক্ষা দেওয়া হত। সাধারণত এই ধরনের বৃত্তিমূলক স্কুলগুলিতে ২ বৎসরের কোর্স ছিল এবং ১৩ থেকে ১৫ বৎসরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতো। গ্রামার স্কুলের তুলনায় বৃত্তিমূলক স্কুলের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

১৯৩৭ সালে ইংলণ্ড-ওয়েল্‌সে মোট ২২০টি কারিগরী স্কুল এবং ৪১টি চারুকলামূলক প্রতিষ্ঠান ছিল; যেখানে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রামার স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩৯৩টি।

সে সময় জনসাধারণের চোখে কারিগরী এবং কলামূলক শিক্ষার স্থান খুব উঁচুতে ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামার স্কুলের শিক্ষাই একাধিপত্য নিয়ে বিরাজ করছিল। স্পেন্‌স্ কমিটি কারিগরী শিক্ষা ও গ্রামার স্কুলের শিক্ষা সবদিক দিয়ে এক পর্যায়ে আনার জন্য "টেকনিক্যাল হাই স্কুল" নামে একটি নতুন শ্রেণীর স্কুল স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। এই স্কুলেতে ১১ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়বে। স্পেন্‌স্ কমিটির এই নির্দেশ ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের শিক্ষার পুনর্গঠন (Educational Reconstruction ) নামক শ্বেতপত্রে গ্রহণ করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রিধারাকে স্বীকার করে নেন। এর ফলে গুরুত্ব ও মর্যাদা উভয় দিক দিয়েই

টেকনিক্যাল স্কুলগুলি গ্রামার স্কুল এবং মডার্ন স্কুলের সমপর্যায়ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক শিক্ষার এই ত্রিধারা সম্বন্ধে কিছু বলা না হলেও ১৯৪৭ সালের শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত "নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা" ( The New Secondary Education ) নামক পুস্তিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার এই ত্রিধারাকে সরকারী নীতির ভিত্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক টেকনিক্যাল স্কুলের পরিকল্পনাটি সরকারীভাবে গৃহীত হলেও এর অবাধ বিকাশের পথে নানা অন্তরায় দেখা দিয়েছে। অনেকেই স্বতন্ত্র ভাবে কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন না এবং মডার্ন ও গ্রামার স্কুলের সঙ্গেই কারিগরী বিভাগ রাখার প্রস্তাব করেন। এর ফলে গত কয়েক বৎসরে অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুলের তুলনায় টেকনিক্যাল স্কুলের অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নি। ১৯৪৭ সালে মোট ৪,৫৪৩টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩১৭টি ছিল টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯৫৩ সালে মোট মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৪৯৭৬ হলেও টেকনিক্যাল স্কুলের সংখ্যা ২৯২তে নেমে আসে। অথচ ১৯৫৪ সালে ছিল ১০টি গ্রামার ও টেকনিক্যালের মিশ্রিত স্কুল, ১৫টি মডার্ন ও টেকনিক্যালের মিশ্রিত স্কুল এবং ১৩টি বহুসাধক (multilateral) বা সর্বব্যাপক (comprehensive) স্কুল।* স্বতন্ত্র মাধ্যমিক টেকনিক্যাল স্কুলের বিকাশে অন্তরায় দেখা দিলেও শিল্পপ্রধান অঞ্চলে যে এর প্রয়োজনীয়তা আছে এটা সকলেই স্বীকার করেন।

দ্বিতীয়ত, টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশের বয়স নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে। স্পেনস্ কমিটির রিপোর্ট, শিক্ষাদপ্তরের পুস্তিকা ইত্যাদিতে ১১+ বয়সকে টেকনিক্যাল স্কুলে ঢোকার যোগ্য বয়স বলে স্বীকার করা হলেও স্যার সিরিল বার্ট, ভার্নন প্রভৃতির মতে ১১+ বয়সে ছেলে-মেয়েদের সাধারণ বুদ্ধির পরিমাপ করা গেলেও তাদের বিশেষ দক্ষতার

* বহুসাধক বা সর্বব্যাপক স্কুলগুলিতে গ্রামার, মডার্ন ও টেকনিক্যাল—এ তিন ধারার শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা আছে। একটি বিশেষ বয়সে শিক্ষার্থী যে কোন একটি বিশেষ শিক্ষাধারা অনুসরণ করে। ৫৮'র পাতা দ্রষ্টব্য।

(যা টেকনিক্যাল স্কুলে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজন) পরিমাপ এ বয়সে করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ১১+ বয়সে কোন ছেলের টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করা উচিত কিনা তা নির্ণয় করা যেতে পারে না। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষার এ তিনটি ধারা এতই স্বতন্ত্রধর্মী যে উপযুক্ত নির্বাচন ছাড়া কোন একটি বিশেষ ধারাকে গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবনের পক্ষে পরম ক্ষতিকর হতে পারে।

তাছাড়া টেকনিক্যাল স্কুলের বাড়ী নিয়েও মতভেদ কম নয়। স্পেনস্ কমিটি টেকনিক্যাল কলেজ বা উন্নত টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অঙ্গরূপে টেকনিক্যাল স্কুলগুলিকে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের মতে তা হলে টেকনিক্যাল স্কুলের সাজসরঞ্জাম, দরকারী যন্ত্রপাতী, উপযুক্ত শিক্ষক কোনটিরই অভাব হবে না। বরং কলেজের ছাত্রদের উপস্থিতি স্কুলের ছেলেদের কাছে অনুপ্রেরণার কাজ করবে। কিন্তু শিক্ষাদপ্তরের মনোভাব অন্য রকম। তাঁরা চান যে অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুলের মতই টেকনিক্যাল স্কুলগুলির নিজস্ব বাড়ী থাকবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র বাড়ীর অভাবে টেকনিক্যাল কলেজের সঙ্গেই টেকনিক্যাল স্কুলগুলি থাকতে বাধ্য হয়েছে।

শিক্ষকদের সম্বন্ধেও একই রকম মতভেদ দেখা যায়। স্পেনস্ রিপোর্ট চেয়েছিলেন যে টেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষকেরাই স্কুলের কাজ চালাবেন কিন্তু শিক্ষা-দপ্তরের প্রচেষ্টা যে স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষকমণ্ডলী থাকবে।

সাধারণত টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক হয় না এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তিরিশ জনের কম দেখা যায়।

টেকনিক্যাল স্কুলের পাঠক্রম সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও শিক্ষাদপ্তর দুটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথমত, বৃত্তিমূলক বিষয় শিখনের পিছনে আগে ২ বছরের টেকনিক্যাল কোর্সে মোট যে সময় ব্যয় করা হত তার চেয়ে যেন বেশী সময় ব্যয় করা না হয়। এর অর্থ হল যে, বর্তমান টেকনিক্যাল স্কুলে মোট সময়ের অর্ধেকেরও অনেক কম সময় ব্যয় করা হয় বৃত্তিমূলক বিষয় শেখার জন্য। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়ের পেছনে যথেষ্ট সময় দেওয়া যাবে না এবং যার সত্যকারের ফলপ্রদ অগ্রগতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না, এমন কোন বিষয় কোন সময়েই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

**নির্বাচনী পরীক্ষা :**

মাধ্যমিক শিক্ষা তিনটি সুনির্দিষ্ট ধারায় বিভক্ত হওয়ার ফলে সবচেয়ে বড় সমস্যা যা দেখা দিয়েছে তা হল কোন্ শ্রেণীর স্কুলের জন্য কে যোগ্য তা নির্ণয় করা। যদিও শিক্ষাদপ্তর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, তবু ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা কিন্তু সেকথা মনে করেন না। ফলে প্রাথমিক স্কুল ছাড়ার পরই পিতামাতাদের প্রথম লক্ষ্য হয় গ্রামার স্কুলে ভর্তি করা। গ্রামার স্কুলে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা ঠিক হয় বিশেষ একটি পরীক্ষার দ্বারা। অতীতে পরীক্ষা ছাড়াও টাকা দিয়ে গ্রামার স্কুলের সিট কেনা যেত কিন্তু বর্তমানে এ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষরা গ্রামার স্কুলের জন্য যে নির্বাচনী পরীক্ষা করে থাকেন তাতে মোটামুটি থাকে ইংরাজী, অঙ্ক এবং কিছুটা বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test)। পিতামাতারা বিশেষভাবে বাড়ীতে কোচিং দিয়ে ছেলেমেয়েদের এই পরীক্ষায় পাশ করাবার চেষ্টা করেন। পূর্বে ধারণা ছিল যে কোচিংএর দ্বারা বুদ্ধির অভীক্ষায় ফল ভাল করা যায় না, কিন্তু বর্তমানে অধ্যাপক ভার্ননের মতে বিশেষ ধরনের কোচিংএর দ্বারা বুদ্ধির অভীক্ষায় অধিক মার্ক পাওয়ানো যেতে পারে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিছক সহজাত শক্তি পরিমাপের জন্য যে নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বুদ্ধির অভীক্ষা এখনও নির্বাচনী পরীক্ষার একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে।

## ৬। শিক্ষা আইন—১৯৪৪
### ( বিস্তৃত বিবরণ )

এই আইনটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। যথা (১) কেন্দ্রীয় পরিশাসন (২) স্থানীয় পরিশাসন (৩) স্বাধীন (Independent) বিদ্যালয় (৪) সাধারণ নিয়মাবলী (৫) আইনটিকে কার্যকরীকরণ ও ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের সংজ্ঞা। প্রত্যেকটি বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেওয়া হল।

**(১) কেন্দ্রীয় পরিশাসন** ( Central Administration ) ঃ

শিক্ষাব্যবস্থার শীর্ষে থাকবেন রাজা বা রাণী। পুরানো শিক্ষাবোর্ডটিকে তুলে দিয়ে তার তার স্থানে শিক্ষার মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Education) গঠন করা হল। শিক্ষামন্ত্রীর কাজ হল ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জনগণের শিক্ষার উন্নতিসাধন করা, এবং নিজের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীনে স্থানীয় শিক্ষার কর্তৃপক্ষরা যাতে জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার সুষ্ঠু সম্পাদন করেন, তা দেখা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী এবং প্রয়োজন মত অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর আর একটি বড় কাজ হল শিক্ষা পরিদর্শক নির্বাচন করা। শিক্ষামন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য থাকবে দুটি উপদেষ্টা সমিতি, একটা ইংলণ্ডের জন্য অপরটি ওয়েলসের জন্য। শিক্ষামন্ত্রীই এই দু'টি উপদেষ্টা সমিতির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিযুক্ত করে থাকেন।

**(২) স্থানীয় পরিশাসন** (Local Administration) ঃ

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বলতে বোঝায় কাউণ্টি কাউন্সিল এবং কাউণ্টি বারো কাউন্সিলগুলিকে। প্রত্যেকটি এল-ই-এ ( স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ) একটি করে শিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করবেন তাঁদের সাহায্য করার জন্য। অবশ্য কমিটি নিযুক্ত করার সময় শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন লাগবে এবং কতকগুলি সর্ত পালন করতে হবে। যেমন, যে কোন শিক্ষাকমিটির অধিকাংশ সদস্য অবশ্যই কাউন্সিলেরও সদস্য হবেন। তাছাড়া কমিটির সদস্যেরা দেশের শিক্ষার অবস্থার সঙ্গে পরিচিত এবং শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হবেন। এল-ই-এ-গুলি তাদের শিক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করবেন

এবং প্রয়োজন হলে কমিটির উপর কোন ক্ষমতা ন্যস্ত করতে পারেন। কমিটি আবার প্রয়োজন হলে সাব-কমিটি নিযুক্ত করতে পারেন এবং তার উপর কোন ক্ষমতা ন্যস্ত করতে পারেন অবশ্য এল-ই-এ'র অনুমোদন নিয়ে।

সুষ্ঠু ও প্রকৃষ্ট পরিচালনার জন্য এল-ই-এগুলিকে তাদের অধীনস্থ স্থানকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে নিতে নির্দেশ দেওয়া হল। এই আঞ্চলিক বিভাজনের তত্ত্বাবধান করবে ডিভিশ্যানাল একজিকিউটিভ (Divisional Executive) বা আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক সংস্থা নামে একটি স্থানীয় সংগঠন। এই কার্যনির্বাহক সংস্থাটির গঠন ও কাজ সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুমোদন থাকা চাই। এই সংস্থাগুলির কাজ হল শিক্ষাকমিটির অধীনে থেকে এল-ই-এ'গুলি যাতে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে তার ব্যবস্থা করা।

এই ধরনের আঞ্চলিক পরিশাসনের বাইরে আছে আবার কতকগুলি জেলা। সেগুলিকে ব্যতিক্রমমূলক জেলা (Excepted District) বলা হয়। কোন জেলায় সাধারণত ৩০০০০-র উর্ধ্বে লোক সংখ্যা হলে বা শিক্ষামন্ত্রীর মতে অন্য কোন বিশেষ কারণ থাকলে তা ব্যতিক্রমমূলক জেলা বলে পরিচিত হবে। এই ধরনের ব্যতিক্রমমূলক জেলায় এল-ই-এ'র উপর প্রদত্ত ক্ষমতা অনেক বেশী থাকে।

প্রত্যেকটি এল-ই-এ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রধান শিক্ষা-আধিকারিক (Chief Education Officer) রূপে নিযুক্ত করবেন, অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুমোদন নিয়ে। তা'ছাড়া প্রয়োজনমত কেরাণী, অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষা-পরিদর্শকও এল-ই-এ নিযুক্ত করবেন।

**শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি স্তর :**

এই আইনে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে পর পর তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হল, যেমন—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর। এল-ই-এ'র কাজ হল যে তার অধীনস্থ অঞ্চলের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এই তিন স্তরের জন্যই উৎকৃষ্ট শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা এবং সেইভাবে জনসমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক বিকাশে সাহায্য করা।

**প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা :**

১৯৪৪ এর আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষাকে বোঝায়

যা ১২ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী। ১৯৪৮ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা এই ধারাটির সংশোধন করে সাড়ে দশ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ( এবং তার চেয়ে বেশী বয়সের যে সব ছেলেমেয়েদের তাদের সঙ্গে পড়ানো উচিত বলে মনে করা হবে তাদের ) পূর্ণকালীন শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় বার থেকে উনিশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে। ১৯৪৮'র শিক্ষা আইনে এই ধারাটির পরিবর্তন করা হয়। নীচের দিকে সাড়ে দশ বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাও মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যেক অঞ্চলে পর্যাপ্ত স্কুল থাকবে। পর্যাপ্ত বলতে কেবলমাত্র সংখ্যার দিক দিয়ে পর্যাপ্ত বোঝায় না—প্রকৃতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দিক দিয়েও স্কুলগুলি পর্যাপ্ত হবে। শিক্ষাথাদের বয়স, শক্তি ও দক্ষতার বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের বিভিন্ন গঠনকালের উপযোগী বিভিন্ন প্রকৃতির উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রয়োগমূলক ( Practical ) শিক্ষাও দেওয়া হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকবে। তা'ছাড়া যেখানে প্রয়োজন হবে নার্সারি স্কুল কিংবা পাঁচ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য ক্লাশ, শারীরিক বা মানসিক বিকলতাসম্পন্নদের জন্য বিশেষধর্মী স্কুল, আবাসিক স্কুল প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করতে হবে। এল-ই-এ'র অধীনস্থ স্কুলবাড়ীগুলি শিক্ষামন্ত্রীর নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী অবশ্যই হবে।

**স্কুলের শ্রেণীবিভাগ ঃ**

স্কুলগুলিকে ভাগ করা হল প্রচলিত দু'ভাগে—কাউণ্টি স্কুল, যেগুলি এল-ই-এ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং স্বতঃসৃষ্ট বা ভলাণ্টারি ( Voluntary ) স্কুল, যেগুলি ধর্মসম্প্রদায় বা অন্যান্য স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরী হয়েছিল। এই স্বতঃসৃষ্ট স্কুলগুলিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, যথা, সাহায্য-প্রাপ্ত ( Aided ), বিশেষ চুক্তিসম্পন্ন ( Special Agreement ) এবং নিয়ন্ত্রিত ( Controlled )।

সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বলতে বোঝায় সেই সব স্কুল যেগুলির পরিচালকেরা শিক্ষামন্ত্রীর অর্থসাহায্য নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্কুলবাড়ীর

সংস্কার সাধন করতে পারবেন। স্কুল বাড়ীর জন্য মোট ব্যয়ের অর্ধেক শিক্ষাদপ্তর থেকে এই ধরনের স্কুলেরা পেয়ে থাকে।

বিশেষ চুক্তির ( Special Agreement ) স্কুলের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৩৬'র শিক্ষা আইনে, যদিও চুক্তি অনুযায়ী কাজ কিছু হয়নি। এই শ্রেণীর স্কুলগুলিকে স্কুলবাড়ী সংস্কারের ব্যয়ের তিন-চতুর্থাংশ এল-ই-এ দিয়ে থাকেন। এ শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

নিয়ন্ত্রিত (Controlled) স্কুলগুলির পরিচালনার ব্যয় এল-ই-এ বহন করে থাকেন।

**পরিচালনা ঃ**

প্রত্যেকটি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলেরই নিজস্ব শাসনমূলক সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে এবং সেগুলির অনুসরণ করে স্কুলের পরিচালকগণ স্কুল চালিয়ে থাকেন। এই শাসনতন্ত্র স্কুলের প্রকৃতি অনুযায়ী ( অর্থাৎ কাউন্টি স্কুল, না ভলাণ্টারি স্কুল, ভলাণ্টারি হলে সাহায্যপ্রাপ্ত, না বিশেষ চুক্তিমূলক, না নিয়ন্ত্রিত ) বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।

কাউন্টি প্রাইমারী স্কুলে পরিচালক মণ্ডলী সম্পূর্ণ এল-ই-এ'র পছন্দ মতো গঠিত হয়ে থাকে। তবে যদি বারো, সহরজেলা, স্থানীয় প্যারিশ ( Parish ) ইত্যাদি গৌণ কর্তৃপক্ষের ( Minor Authority ) অধীনস্থ স্কুল হয় তবে পরিচালকমণ্ডলীর দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নিযুক্ত করবে ঐ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

ভলাণ্টারি প্রাথমিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর কিছু সদস্য নিযুক্ত করবে এল-ই-এ, কিম্বা ঐ বিশেষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানটি। স্কুলের স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকদের বলা হয় প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ( Foundation Managers)। সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিশেষচুক্তিমূলক স্কুলগুলিতে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক থাকতে পারবে মোট দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ, বাকী নির্বাচিত করবে এল-ই-এ। তবে যদি স্কুলটি গৌণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এলাকায় পড়ে তবে তাদেরও পরিচালক নির্বাচনে অংশ থাকবে।

কাউন্টি মাধ্যমিক স্কুলেরও পরিচালক মণ্ডলীর সংখ্যা ও সদস্য নির্ধারিত হয় এল-ই-এ'র নির্দেশ মত। যদি স্কুলটি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে পরিচালক মণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ, এবং যদি সাহায্যপ্রাপ্ত বা বিশেষচুক্তির স্কুল

হয় তবে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, অর্থাৎ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সংস্থাটির দ্বারা নির্বাচিত পরিচালক এবং এক-তৃতীয়াংশ হবে এল-ই-এ'র নির্বাচিত।

**শিক্ষণ ও শিক্ষক ঃ**

সমস্ত কাউন্টি স্কুল এবং কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি ছাড়া সমস্ত ভলাণ্টারি স্কুলের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা ছাড়া আর সকল প্রকার শিক্ষাঘটিত ব্যাপারই এল-ই-এ'র অধীনে। কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত ( Aided ) মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। সেখানে শিক্ষার ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করেন স্কুলের নিজস্ব পরিশাসকগণ।

কাউণ্টি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এল-ই-এ'র হাতে। কিন্তু ভলাণ্টারি স্কুলগুলিতে এল-ই-এ'র ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ। তার কারণ হল অধিকাংশ ভলাণ্টারি স্কুলে বিশেষ সম্প্রদায়-মূলক ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই বিশেষপ্রকৃতির ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করার ব্যাপারে ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সংস্থাটির মতামত অনুযায়ী এল-ই-এ'কে কাজ করতে হয়।

ভলাণ্টারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ভার স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীর হাতে। তবে শিক্ষকের সংখ্যা নির্ধারিত করে দেবে এল-ই-এ এবং শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার সময় এল-ই-এ'র অনুমোদন লাগবে।

ভলাণ্টারি নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমিক স্কুলে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা দেবার শিক্ষক ( এঁদের বলা হয় সংরক্ষিত শিক্ষক বা রিজার্ভড্ টিচার ) ছাড়া আর সকল প্রকারের শিক্ষকই নিযুক্ত করবে এল-ই-এ। ভলাণ্টারি বিশেষচুক্তি মাধ্যমিক স্কুলের সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

**ধর্মমূলক শিক্ষা ঃ**

১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী সব শ্রেণীর স্কুলেই ধর্মমূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক স্কুলেই দিনের সুরু হবে সম্মিলিত প্রার্থনার সঙ্গে এবং ধর্মমূলক শিক্ষা দেবার স্বতন্ত্র আয়োজন থাকবে। কাউণ্টি স্কুল-গুলিতে ধর্মমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী এবং এই শিক্ষা কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম-মূলক হবে না। এই পাঠক্রম তৈরী

করার সময় এল-ই-এ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, শিক্ষকমণ্ডলী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সম্মেলন ডাকেন। এই সম্মেলনের কাজ হল এমন একটি পাঠক্রম তৈরী করা যাতে সকলের সম্পূর্ণ অনুমোদন থাকবে। যদি এই ধরনের সম্পুর্ণ অনুমোদন না পাওয়া যায় তবে শিক্ষামন্ত্রী নিজে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তার হাতে অনুমোদিত পাঠক্রম রচনা করার ভার দেন। অভিভাবকের যদি তেমন ইচ্ছা হয় তবে কোন শিক্ষার্থীকে সম্মিলিত প্রার্থনা বা ধর্মমূলক শিক্ষাদানে যোগ না দিতে এবং অন্য কোথাও সম্প্রদায়মূলক ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ ধরনের অনুমতি তখনই দেওয়া হবে যখন ঐ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়মূলক কোন স্কুল ঐ শিক্ষার্থীর বাসস্থানের আশেপাশে থাকবে না।

ভলাণ্টারি স্কুলে সম্প্রদায়মূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে তবে তা ঐ স্কুলের স্থাপনকালীন দলিলের নির্দেশ অনুযায়ী হবে। কাউণ্টি স্কুলের মত ভলাণ্টারি স্কুলেও অভিভাবকের ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ঐ স্কুলের ধর্মশিক্ষায় যোগ নাও দিতে পারে এবং তার পরিবর্তে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

কাউণ্টি স্কুল বা ভলাণ্টারি স্কুল, কেউই শিক্ষার্থীকে সান-ডে স্কুল বা অন্য কোন ধর্মমূলক উপাসনার ক্ষেত্রে যোগ দিতে বা যোগ না দিতে বাধ্য করতে পারে না। সংরক্ষিত শিক্ষক (অর্থাৎ যাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়মূলক ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত) ছাড়া কোন শিক্ষককেই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মমত বা ধর্মমূলক আচরণের জন্য বরখাস্ত করা, উন্নতি বন্ধ করা বা কম পারিশ্রমিক দেওয়া চলবে না।

**বাধ্যতামূলক যোগদান ঃ**

১৯৪৪'র আইন অনুযায়ী ৫ বছর বয়সের সুরু থেকে ৫ বছর বয়সে পা দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে স্কুলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। (অবশ্য ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে এই সর্তটিকে প্রথম কার্যকরী করা হয়।) সেই আইনে আরও বলা হল যে শিক্ষামন্ত্রীর কর্তব্য হবে যত সত্বর সম্ভব বয়সের এই উর্ধ্ব সীমাকে ১৬ বছরে তোলা। আর প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য হল এই বাধ্যতামূলক বয়সের মধ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বয়স, সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী নিয়মিত স্কুলে যোগদান বা অন্য কোন পন্থার

মাধ্যমে কার্যকরী পূর্ণকালীন শিক্ষা দেওয়া। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে আইন অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাড়ীতেও দেওয়া যায় যদি অবশ্য সে শিক্ষা কার্যকরী ও পূর্ণকালীন হয়।

**স্কুল বেতন ঃ**

এল-ই-এ'র পরিচালিত কোন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বেতন না নেওয়া যেতে পারে।

**অধিকতর শিক্ষা ঃ**

১৯৪৪'র শিক্ষা আইনের দ্বারা পরিকল্পিত ত্রি-স্তর শিক্ষাব্যবস্থার শেষ স্তর হল অধিকতর ( Further ) শিক্ষা। যাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণের বয়স পার হয়ে গেছে তাদের জন্যই এই শিক্ষার ব্যবস্থা। এতে যেমন এক দিকে আছে এই সব ব্যক্তিদের জন্য পূর্ণকালীন এবং অংশ-কালীন শিক্ষার আয়োজন তেমনই অপর দিকে আছে তাদের অবসরকালের যথাযথ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা।

অধিকতর শিক্ষার ক্ষেত্র ব্যাপকতম। বাধ্যতামূলক স্কুলশিক্ষার পরে যতপ্রকার শিক্ষা থাকতে পারে সবই অধিকতর শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে। এর একপ্রান্তে যেমন আছে কারিগরী কলেজ বা চারুকলা কলেজ প্রভৃতিতে অতি-উন্নতস্তরের শিক্ষা, তেমনই অপরপ্রান্তে থাকতে পারে কোন যুব-সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বা কোন গ্রামের নারীকল্যাণ সমিতির অতি সাধারণ শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা। প্রত্যেক স্থানের এল-ই-এ'র কাজ হ'ল শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে সেই অঞ্চলের উপযোগী অধিকতর শিক্ষার একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করা। এই কর্মসূচী প্রস্তুত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলির এল-ই-এ'র অনুসৃত এই ধরনের কর্মসূচীর কথা মনে রাখতে হবে, এবং দেখতে হবে কোথাও যাতে একই ধরনের কর্মসূচী দুটি প্রতিষ্ঠান অনুসরণ না করে।

**কাউণ্টি কলেজ ( County College ) ঃ**

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে কাউণ্টি কলেজ নামে এক নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইনটিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ঐই আইন পাশের তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক স্থানীয়

শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে তার অঞ্চলের জন্য কাউন্টি কলেজ স্থাপন করতে হবে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল এই তিন বৎসর পূর্ণ হয়ে গেলেও কাউন্টি কলেজ স্থাপন করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, কাউন্টি কলেজের পরিকল্পনাটি এই আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং আশা করা যায় যে উপযুক্ত সময় হলেই ইংলণ্ডের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই কলেজগুলি প্রবর্তিত করবেন।

কাউন্টি কলেজ হল সেই সব তরুণ বয়স্কদের জন্য যাদের বয়স বাধ্যতামূলক বয়স অর্থাৎ ১৫ বৎসর পার হয়ে গেছে কিন্তু ১৮ বৎসর বয়সের নীচে আছে। পরে যখন এই বাধ্যতামূলক বয়সের উর্ধ্বসীমা ১৬তে তোলা হবে তখন কেবলমাত্র ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা কাউন্টি কলেজে শিক্ষা লাভ করবে। কাউন্টি কলেজের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের "বিভিন্ন কুশলতা ও সামর্থ্যের পূর্ণবিকাশ করা" এবং "নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রস্তুত করা।" শারীরিক, প্রয়োগমূলক ও বৃত্তিমূলক এই তিন প্রকার শিক্ষণই এর পাঠসূচীর অন্তর্গত হবে। সাধারণত ধরে নেওয়া হচ্ছে যে স্কুল পার হবার পর ছেলেমেয়েরা কোন চাকরী বা বৃত্তি গ্রহণ করবে এবং তার অবসর সময়ে কলেজে যোগ দেবে। বৎসরে ৪৪ সপ্তাহের প্রতি সপ্তাহে পুরো ১ দিন করে বা ২টি অর্ধদিন করে তাদের কলেজে যোগ দিতে হবেই। কিংবা যেখানে সুবিধাজনক মনে হবে ক্রমান্বয়ে ৮ সপ্তাহ কিংবা ক্রমান্বয়ে ৪ সপ্তাহ করে বছরে দুবার যোগ দিতেও পারে। মোট কথা সাধারণ ক্ষেত্রে বছরের ৪৪ দিন তাদের কলেজে ক্লাশ করতে হবেই। অবশ্য এল-ই-এ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যোগদানের সময় পরিবর্তন করতে পারেন। যারা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন রকম শিক্ষালাভ করছে এবং যদি সেই শিক্ষাকে কলেজের শিক্ষার সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়, তবে তাদের কলেজে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক মুক্তি দেওয়া হবে। কলেজে যাতে ঠিকমত ছেলেমেয়েরা যোগদান করে তার জন্য বিস্তারিত পন্থার অবলম্বন করা হয়েছে।

**আনুষঙ্গিক বিধানাদি ঃ**

১। **স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসা ঃ**—এল-ই-এ তাঁদের পরিচালিত সমস্ত স্কুল এবং কাউন্টি কলেজে উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য

পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। যাতে ছেলেমেয়েদের এই পরিদর্শনের জন্য বাধ্য করা যায় তার ক্ষমতাও এল-ই-এ'কে দেওয়া হল। বিনামূল্যে পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থাও এল-ই-এ করবেন। অবশ্য যদি পিতামাতার কোন চিকিৎসা সম্বন্ধে আপত্তি থাকে তবে সে চিকিৎসা থেকে এল-ই-এ বিরত থাকবেন।

২। **আহার ও দুধের ব্যবস্থা** ঃ—এল-ই-এ'র অধীনস্থ স্কুল এবং কাউণ্টি কলেজগুলিতে দুধ, আহার ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু সরবরাহ করাও এই আইনের দ্বারা এল-ই-এ'র অন্তর্ভুক্ত হল। ১৯৪৪ সালের আগে অনেক এল-ই-এ স্কুলে ক্যাণ্টিনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং খাবারের দাম হিসেবে পিতামাতার কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করে নিতেন। ১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী খাদ্যের দাম ধার্য করা বা না করা নির্ভর করছে শিক্ষা-মন্ত্রীর উপর।

৩। **পোষাক** ঃ—১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুযায়ী যখন এল-ই-এ বুঝবেন যে কোন শিক্ষার্থীকে পোষাক সরবরাহ করাটা তার সুষ্ঠু শিক্ষালাভের পক্ষে অপরিহার্য তখন এল-ই-এ তাকে পোষাক সরবরাহ করবেন। পরে ১৯৪৬ সালের শিক্ষা আইন ও ১৯৪৮ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা পোষাক সরবরাহের ক্ষমতাটিকে প্রসারিত করা হয়েছে এবং তার সর্তগুলিও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই দু'টি আইনে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যে সব ছেলেমেয়েরা বাড়ী ছেড়ে এল-ই-এ'র পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত নার্সারিতে, কিংবা কোন কাউণ্টি কলেজ বা বিশেষধর্মী স্কুলে ( তা সে এল-ই-এ'র পরিচালিত হোক আর নাই হোক ) বাস করে তবে সেই সব ছেলেমেয়েদের এল-ই-এ পোষাক সরবরাহ করতে পারেন। শরীরচর্চার জন্য সাজসরঞ্জামও এর অন্তর্গত। যেখানে সম্ভবপর সেখানে পিতামাতার কাছ থেকে এই বাবদ কিছু অর্থ আদায় করা যেতে পারে।

৪। **চিত্তবিনোদন এবং সামাজিক ও শারীরিক শিক্ষা** ঃ—প্রত্যেক এল-ই-এ অবশ্যই তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলে যাতে চিত্ত-বিনোদন এবং সামাজিক ও শারীরিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা থাকে তার ব্যবস্থা করবেন। এর জন্য হয় তাঁদের নিজেদের প্রচেষ্টায় নয় অন্য কোন সংস্থাকে সাহায্যের

মাধ্যমে ক্যাম্প, ছুটির দিন, ক্লাস, খেলার মাঠ, খেলার আসর ইত্যাদি স্থাপন করার ব্যবস্থা করবেন। এই ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল হবে এবং এল-ই-এ যুব সংগঠন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অবশ্যই সহযোগিতা রাখবেন।

৫। **পরিবহন**ঃ—ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুল কলেজ কিংবা অধিকতর শিক্ষার কোন ক্লাসে ঠিক যোগ দিতে পারে সেইজন্য এল-ই-এ প্রয়োজনীয় পরিবহনের ব্যবস্থা করবেন। যদি এল-ই-এ পরিবহনের কোন ব্যবস্থা করতে না পারেন, তবে যাতায়াতের ব্যয়ভার দিয়ে দেবেন। স্কুল যদি পায়ে হাটা যায় এমন দূরত্বের মধ্যে হয় তবে অবশ্য পরিবহনের দায়িত্ব স্কুলের নয়। পায়ে হাটার দূরত্ব বলতে বোঝায় আট বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে দু' মাইল এবং তার বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে তিন মাইল।

৬। **শিশু এবং কিশোরদের শ্রমে নিয়োগ**ঃ—শিশু ও কিশোর-দের শ্রম-নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইংলণ্ডে নানারূপ আইন আছে। শিক্ষা আইনের আওতায় এই ব্যাপারটি সরাসরি পড়ে না। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা স্কুল পরিত্যাগের বয়স ১৫ বৎসরে তোলায় "শিশু" কথাটির সংজ্ঞাই বদলে গেছে। এখন থেকে ১৫ বৎসর বয়সের নীচে হলেই সে শিশুর পর্যায়ে পড়বে এবং শিশু ও কিশোর শ্রমের আইনগুলি তার উপর প্রযোজ্য হবে। এর পরে যখন স্কুল পরিত্যাগের বয়সটি ১৫ থেকে ১৬ বৎসরে তোলা হবে তখন "শিশু" বলতে ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক মাত্রকেই বোঝাবে এবং শিশু এবং কিশোর শ্রমের আইনগুলি তার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি ১৫ বৎসর বয়সের (পরে ১৬ বৎসর) নীচের কোন ছেলে বা মেয়ে এমনভাবে কাজে নিযুক্ত হয় যার ফলে সে তার শিক্ষালাভের পূর্ণ-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে এল-ই-এ তার সেই কাজ বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

**স্বাধীন স্কুল (Independent School)ঃ**

১৯২১ সালের শিক্ষা-আইনে বলা হয়েছিল যে প্রত্যেক পিতামাতা তাঁদের স্কুল-গামী বয়সের ছেলেমেয়েদের পঠন-লিখন ও গণিতের কার্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা দিতে বাধ্য। তাঁরা যদি এল-ই-এ'র পরিচালনার অধীন কোন স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ান তবে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ঠিকমতই

করলেন। আর যদি তাঁরা ছেলেমেয়েদের কোন স্বাধীন ( Independent ) স্কুলে পড়ান, তবে এল-ই-এ সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্কুল পরিদর্শন করতে চাইতে পারেন। যদি স্কুলটি পরিদর্শন করা চলে এবং যদি সেখানকার শিক্ষা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পিতামাতাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই। কিন্তু যদি স্কুলটি পরিদর্শন করতে না দেওয়া হয় তবে সেই পিতামাতারা তাঁদের ছেলেমেয়েরা কার্যকরী শিক্ষা পাচ্ছে একথা বলতে পারবেন না এবং এল-ই-এ প্রয়োজন হলে সেই পিতামাতার বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারেন। এইভাবে এল-ই-এ যে সব স্বাধীন স্কুলকে অনুপযোগী বলে মনে করতেন সেগুলিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা রাখতেন।

কিন্তু এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট জটিল ও আয়াসসাপেক্ষ। বিশেষ করে কোন স্বাধীন স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা এল-ই-এ'র পক্ষে সম্ভব ছিল না। এল-ই-এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন অভিভাবকদের বিরুদ্ধে এবং পরোক্ষভাবে স্বাধীন স্কুলে ছাত্র পাঠান বন্ধ করতে পারতেন। তার ফলে এই ব্যবস্থা কোনদিনই অবলম্বন করা হয়নি এবং অনুপযোগী স্বাধীনস্কুলের প্রসারও রোধ করা যায়নি।

১৯৪৪ সালের আইনে স্বাধীনস্কুলের বিরুদ্ধে আরও সহজ ফলপ্রদ পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী স্বাধীন স্কুলের একটি খাতা বা রেজিষ্টার তৈরী করবেন। স্বাধীন স্কুলগুলির সত্বাধিকারীদের দায়িত্ব হল সেই রেজিষ্টারে নিজেদের নাম তোলা। যদি এই আইনটি বলবৎ হবার ছ'মাসের মধ্যে কোন স্বাধীন স্কুলের মালিক তাঁর স্কুলের নাম এই রেজিষ্টারে না তোলেন তবে তিনি আইনের চোখে অপরাধী হবেন। রেজিষ্টারে নাম ওঠানোর জন্য কতকগুলি তথ্য স্কুলের মালিককে সরবরাহ করতে হবে। যদি শিক্ষামন্ত্রী বোঝেন যে স্কুলটির বাড়ী অনুপযুক্ত, কিংবা শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ কিংবা শিক্ষক বা পরিচালকগণ তাঁদের কাজের জন্য যোগ্য নন তবে শিক্ষামন্ত্রী সেই স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন এবং একটি বিশেষ তারিখে জানিয়ে দেবেন যে ঐ তারিখের মধ্যে ঐ ত্রুটি দূর করতে হবে। এইভাবে অভিযুক্ত স্কুলের মালিক ইচ্ছা করলে একটি বিচারমণ্ডলীতে ( tribunal ) আপীল করতে পারেন। এই বিচারমণ্ডলীতে দুটি বিভিন্ন দল থাকে, আইন-মূলক দল ও শিক্ষামূলক দল। অভিযোগটি শোনার পর বিচারকমণ্ডলী অভি-

যোগটি বাতিল করতে পারেন কিংবা অভিযোগটি মেনে নিয়ে স্কুলটির নাম রেজিষ্টার থেকে একেবারে অপসারিত করতে পারেন কিংবা স্কুলটির যে অঙ্গটি ( অর্থাৎ বাড়ী কিংবা শিক্ষক কিংবা পরিচালক ) অনুপযোগী বলে মনে করেন সেই অংশটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন।

১৯৪৪ সালের আইনে স্বাধীন স্কুলের বিরুদ্ধে এই ধরনের পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা থাকলেও আজ পর্যন্ত আইনের এই ধারাটিকে কার্যকরী করা হয় নি। ১৯৫৪ সালে হাউস অফ্ কমন্সে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে ১৯৫৭ সাল নাগাদ আইনের এই অংশটিকে কার্যকরী করা হবে।

**আর্থিক ব্যবস্থা ঃ**

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কোন কাজ করতে গেলে এল-ই-এ'কে যে ব্যয় করতে হয় সে বাবদ শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের অর্থ সাহায্য করে থাকেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অর্থ শিক্ষামন্ত্রী দেন না, সে টাকা আসে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। শিক্ষামূলক কাজের জন্য বা শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার জন্য শিক্ষামন্ত্রী কোন ব্যক্তি বা জনহিতৈষী সংস্থাকে অর্থসাহায্য করতে পারেন। যেমন, আইন-নির্দিষ্ট কোন বিশেষ সর্ত পালনে সাহায্য করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিচালকদের তাঁদের ব্যয়ের অর্ধেক দিয়ে থাকেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সরাসরি অর্থসাহায্যও শিক্ষামন্ত্রী দিয়ে থাকেন। যদি শিক্ষামন্ত্রী বোঝেন যে কোন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় ব্যয় ভার বহনে অক্ষম এবং তার ফলে শিক্ষাঘটিত সুবিধা সম্পূর্ণ গ্রহণে সে অসমর্থ তাহলে শিক্ষামন্ত্রী তাকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষণ গ্রহণের জন্য যে সব শিক্ষার্থী ইচ্ছুক তাদেরও শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি অর্থসাহায্য করে থাকেন।

অর্থের লেনদেনের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এল-ই-এ, বিভিন্ন স্বাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এবং বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সরাসরি যোগাযোগ আছে। শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজকে অর্থসাহায্য করেন না। তারা সাহায্য পায় সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস্ কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী।

শিক্ষামন্ত্রীর অধিকাংশ অর্থসাহায্য অবশ্য যায় এল-ই-এ'র ঘরে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এল-ই-এ'র মোট খরচের শতকরা ৪৯.৩৬ ভাগ শিক্ষামন্ত্রীই

দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন পাশ হওয়ার পর এল-ই-এ'র মোট খরচের শতকরা ৫৪.৩৬ ভাগ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী এবং যেখানে এল-ই-এ'র আর্থিক অবস্থা মন্দ সেখানে আরও বেশী দিয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষাদপ্তর থেকে যে অর্থসাহায্য দেওয়া হয় তা নির্ভর করে তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর। প্রথম, শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অধীনে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা; দ্বিতীয়, শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মোট ব্যয়ের পরিমাণ এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ব্যয় করার ক্ষমতা। এ ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণ, স্কুলে আহারের ব্যবস্থা, দুধের ব্যবস্থা, বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল অপসারণ, যুদ্ধের প্রতিরোধ কার্য ইত্যাদি নানা বিভিন্ন কাজেও শিক্ষাদপ্তর থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়।

**বিবিধ বিধানাদি :**

**ছাত্রবৃত্তি ও অন্যান্য সাহায্যাদি :** ১৯৪৪ সালের আইনে এল-ই-এ'কে বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের ব্যয়ভার বহন করার জন্য আইন কানুন প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। এল-ই-এ প্রয়োজন বুঝলে ছাত্রবৃত্তি-রূপে বা অন্যান্যভাবে ছেলেমেয়েদের অর্থসাহায্য দিতে পারেন। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত স্তরেই নানাভাবে ছেলেমেয়েদের অর্থসাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

**শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষক-কল্যাণ ইত্যাদি :** শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করতে বা তাতে সাহায্যদান করতে কিংবা শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে কোন সুবিধা দিতে শিক্ষামন্ত্রী এল-ই-এ'কে নির্দেশ দিতে পারেন। শিক্ষকদের বেতনের স্কেল বিবেচনা করার জন্য এক বা একের বেশী কমিটি যাতে গঠিত হয় তা দেখাও শিক্ষামন্ত্রীর কাজ। এই সব কমিটিতে থাকবেন শিক্ষক এবং এল-ই-এ'র প্রতিনিধিরা। এই কমিটি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে সুপারিশ পেশ করবেন। শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন করলে এল-ই-এ'কে সেই নির্দেশ অনুযায়ী বেতন দিতে হবে।

## ৭। কেন্দ্রীয় পরিশাসন

ইংলণ্ডে স্কুলের সৃষ্টি যদিও হয়েছে গত তেরোশ বছরেরও বেশী, রাষ্ট্রের সুসংহত হস্তক্ষেপের ইতিহাস কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের বেশী নয়। তার পূর্বে যে একক প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করত সেটি হল ইংলণ্ডের চার্চ বা যাজকসম্প্রদায়। শিক্ষাদানের অনুমতি পত্র তখন চার্চ থেকে দেওয়া হত। ১৮৩৩ সালেই প্রথম ইংলণ্ডের রাষ্ট্র দেশের শিক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ঐ সালে পার্লামেন্টে ২০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ হল স্কুলের বাড়ী তৈরী এবং দরিদ্র প্রজাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ঐ টাকা বিতরণের জন্য কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়নি। দরিদ্রদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য জাতীয় সঙ্ঘ ( National Soceity ) এবং ব্রিটিশ ও বিদেশী স্কুল সঙ্ঘ ( British & Foreign Society ) নামে দু'টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঐ টাকাটা ভাগ করে দেওয়া হত। কি ভাবে টাকাটা ব্যয় করতে হবে তার জন্য কোন সর্তও তখন আরোপ করা হত না। ১৮৩৯ সালে সরকার প্রিভি কাউন্সিলের ( Privy Council ) একটি নির্বাচনী কমিটি ( Select Committee ) গঠিত করেন। এই কমিটির কাজ ছিল জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের জন্য পার্লামেন্টের বরাদ্দ টাকার ব্যয়কার্যের তদ্বির করা। এই কমিটিকেই শিক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য ইংলণ্ডের প্রথম রাষ্ট্রনিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলা চলতে পারে। তবে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই কমিটির কাজ সীমাবদ্ধ ছিল, মাধ্যমিক শিক্ষায় বরাদ্দ টাকার তদ্বির করা কমিটির আওতার বাইরে ছিল।

১৮৫১ সালে সরকার দেশে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ ( Science and Art Department ) প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিভাগটিকে শিক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বিতীয় রাষ্ট্রনিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। প্রথম প্রথম এর কাজ ছিল দেশে বিজ্ঞান এবং কলা সম্বন্ধীয় শিক্ষা বিস্তার করা। পরে কারিগরী ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সমস্ত বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার কাজও এই বিভাগটির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৩ সালে প্রিভিকাউন্সিলের নির্বাচনী কমিটিটি কাউন্সিলের-কমিটির-

শিক্ষাবিভাগ নামে পরিচিত হয়। তখন বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগটিও ঐ বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

১৮৬৯ সালে চ্যারিটি কমিশন নামে আরেকটি সংস্থা গঠিত হয়। দান-প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির জন্য টৌনটন ( Taunton ) কমিশন যে বিবরণীটি প্রকাশ করেন, সরকার তার উপর নির্ভর করে দানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির আইন ( Eudowed School Act ) পাশ করেন। এরপর দানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-গুলির জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৮৭৪ সালের চ্যারিটি কমিশনের সঙ্গে এই কমিশনটি সংযুক্ত হয়ে যায়। এই কমিশনগুলির কাজ ছিল দানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির কার্যভার পরিদর্শন করা এবং তাদের সুপরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১৮৯৪ সালে সরকার ব্রাইস কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল একটি জটিল সমস্যার সমাধান করা। এই সময় দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় পরিশাসনের হাতে শিক্ষার ব্যাপারে একাধিক বিভিন্ন কার্যের ভার রয়েছে এবং তার জন্য একাধিক বিভাগ বা কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যের সুনির্ধারিত সীমারেখা ছিল না। যেমন প্রিভিকাউন্সিলের শিক্ষাবিভাগের কাজ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা। বহুক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুল ত্যাগ করার বয়স পার হয়ে গেলেও ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিক স্কুলেই থাকত এবং তাদের বয়সের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগকেই করতে হত। যদিও এই স্কুলগুলি নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে পরিচিত ছিল তবু এগুলিতে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের জন্য উন্নত গণিত, আধুনিক ভাষা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়ান হত। ফলে এই সকল বিদ্যালয়গুলি একদিকে শিক্ষাবিভাগের কাছ থেকেও যেমন সাহায্য পেত তেমনি আবার এগুলিতে বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলি পড়ান হত বলে এগুলি বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ থেকেও সাহায্য পেত। সেই রকম চ্যারিটি কমিশন নামক সংস্থাটিও গ্রামার স্কুল এবং সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল এই দু'ধরনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। আবার শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যাপারেও শিক্ষাবিভাগের যথেষ্ট হাত ছিল। কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৮৯ সালের একটি আইনের জোরে দেশের কাউন্টি এবং কাউণ্টিবারোর কাউন্সিলগুলো কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের জন্য কর ধার্য করার ক্ষমতা লাভ করেছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষমতা-সম্পন্ন অনেকগুলো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা গঠিত হয়েছিল যার ফলে শিক্ষা প্রসারের কাজটি মোটেই ভালভাবে সম্পন্ন হচ্ছিল না। এই অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য একটি একক শিক্ষানিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে ১৮৯৯ সালে গঠিত হয়েছিল শিক্ষা বোর্ড ( Board of Education )।

এই একক ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড গঠনে এত দেরী হওয়ার একটি কারণ হল যে জনসাধারণের শিক্ষা রাষ্ট্রের কর্মভুক্ত হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে বহু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ বেশ সন্দেহ পোষণ করতেন। তার ফলে শিক্ষার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধিকার শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই যে এই মনোভাব প্রবল ছিল তা নয়। বিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা করায়ত্ত করতে রাষ্ট্রের প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মত সময় লেগেছিল।

১৮৯৯ সালের আইনের ফলে বোর্ড অফ এডুকেশন বা শিক্ষা বোর্ড নামে কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল। এর সদস্য ছিলেন একজন প্রেসিডেন্ট, প্রিভিকাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট (Lord President), পাঁচজন প্রধান রাষ্ট্র সম্পাদক (Secretary of State), ট্রেজারির প্রথম লর্ড (First Lord) এবং রাজস্ব বিভাগের অধিনায়ক (Chancellor of the Exchequer)। পুরানো শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগের সমস্ত কাজ এবং চ্যারিটি কমিশনারদের প্রায় সমস্ত শিক্ষামূলক কাজই এই বোর্ডটি করায়ত্ত করে নিয়েছিল। এমন কি কৃষিবোর্ডের কাজগুলিও এই বোর্ডের হাতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই শিক্ষাবোর্ডটি গঠনের সময় সরকার ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি তত্ত্বাবধান করা এই বোর্ডের কাজ বলে ঘোষণা করেন। ১৯৪৪ সালের আইন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বোর্ডটি ছিল ইংলণ্ডের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় সংস্থা। ১৯৪৪ সালের আইনে এই শিক্ষাবোর্ডটি তুলে দিয়ে তার স্থানে মন্ত্রীপরিষদের অন্তর্গত একটি শিক্ষাদপ্তর খোলার ব্যবস্থা হয়। যত দিন শিক্ষাবোর্ড ছিল ততদিন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির তত্ত্বাবধানেতেই সরকারের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সাল থেকে

যখন শিক্ষার মন্ত্রীদপ্তর গঠিত হল তখন থেকে শিক্ষার সর্বতোমুখী প্রসার করাও সরকারের কাজের অন্তর্ভুক্ত হল।

১৯৪৪ সালের আইনটির প্রণয়নকারীগণ বুঝেছিলেন যে দু'একটি শিক্ষা-বোর্ডের মাধ্যমে দেশের বহুমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেটান সম্ভব হবে না। বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের যতই ক্ষমতা থাকনা তিনি কোন মতেই কেবিনেটের মন্ত্রীর সমকক্ষ নন। তদানীন্তন ইংলণ্ডের শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকার কার্যকরী পরিবর্তন আনা কেবিনেটের মন্ত্রীর চেয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়—এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেই ১৯৪৪ সালের আইন প্রণয়ন-কারীরা শিক্ষার চরম ক্ষমতা একটি মন্ত্রীদপ্তরের হাতে উঠিয়ে দিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সুরু হয় ১৮৩৩ সালে (যখন প্রথম পার্লামেণ্ট শিক্ষার খাতে ২০ হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ করেছিলেন) এবং তার পরিপূর্ণতা ঘটে ১৯৪৪ সালে যখন অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষার বিভাগটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মন্ত্রীদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হল।

১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী শিক্ষাদপ্তরটির হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান কাজ হল ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার করা। এর জন্য তিনি তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার অধীনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা নীতিটি যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয় তার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষামন্ত্রীর কর্তব্য যেমন প্রচুর, দায়িত্বও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যদি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে কাজ করে তবে তিনি তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং যেভাবে কাজ করলে ভাল হয় সেইভাবে তাকে কাজ করতে প্ররোচিত করতে পারেন।

১৯৪৪ সালের আইনে শিক্ষামন্ত্রীকে যেমন প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তেমনি ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয় তার জন্য যথেষ্ট প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রীর উপদেষ্টা সংস্থাগুলি (Advisory Councils) শিক্ষার মূলতত্ত্ব এবং প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা-মন্ত্রীকে উপদেশ দেবেন। এই সংস্থাগুলি থাকার ফলে শিক্ষামন্ত্রী আকস্মিক বা অযথা কিছু করে উঠতে পারেন না। তাছাড়া আইনের পঞ্চমধারা অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রী বছরে একবার করে পার্লামেণ্টে তাঁর বিবরণী পেশ

করবেন এবং তাঁর সেই বিবরণীর মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা সংস্থা-গুলির গঠন ও কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকবেই।

বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থাটির তিনটি অঙ্গ আছে—প্রথম রাজনৈতিক—শিক্ষামন্ত্রী এবং তাঁর পার্লামেণ্টারীয় সেক্রেটারী; দ্বিতীয়, উপদেশমূলক—কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলী এবং তৃতীয়, সরকারী কর্মচারীর দল। এই তৃতীয় দলে পড়ে শাসন সংশ্লিষ্ট এবং পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি। শিক্ষামন্ত্রীর পার্লামেণ্টারীয় সেক্রেটারী তাঁকে প্রয়োজনমত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন, যদিও কাজের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন শিক্ষামন্ত্রী একা।

**কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলী (Central Advisory Councils):** প্রত্যেকটি উপদেষ্টা মণ্ডলীর চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সেক্রেটারী নিযুক্ত হন শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারা। উপদেষ্টামণ্ডলীর সেক্রেটারী হন মন্ত্রীদপ্তরেরই কোন কর্মচারী। জনসাধারণের শিক্ষার আইনানুগ প্রথার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদের নিয়োগকাল ও অবসর গ্রহণের সর্তাদি অনুযায়ী ব্যবস্থা করার দায়িত্বও শিক্ষামন্ত্রীর। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কার্যকাল হল তিন বৎসর এবং অন্যান্য সদস্যের ছ' বৎসর। শিক্ষামন্ত্রী ইচ্ছা করলে অবশ্য চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্যের কার্যকাল বাড়িয়ে দিতে পারেন।

১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডের জন্য একটি এবং ওয়েল্‌সের জন্য একটি, মোট দু'টি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয়। পরে শিক্ষামন্ত্রী আরও দু'টি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করেন—একটি শিল্পমূলক এবং বাণিজ্যিক শিক্ষার উপর (Council on Education for Industry and Commerce), অপরটি শিক্ষকদের যোগান ও শিক্ষণের উপর (Council on the Training and Supply of Teachers).

**সরকারী কর্মচারী (Civil Service):** পূর্বেকার শিক্ষাবোর্ড তার নিজেদের কর্মচারীদের প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত করার ক্ষমতা ভোগ করত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এ প্রথা লোপ পেয়েছে। এখন অন্যান্য দপ্তরের মত শিক্ষাদপ্তরটিও বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

এই সরকারী কর্মচারীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রশাসক ( administrative ) কর্মচারী, কার্যনির্বাহক কর্মচারী এবং সাধারণ করণিক সম্প্রদায়। প্রশাসক কর্মচারীদের কাজ হল শিক্ষামন্ত্রীর বিচারের জন্য নীতিঘটিত প্রশ্নাদি পরীক্ষা করা এবং সেগুলির সংব্যাখ্যান করা। এঁদের শীর্ষে থাকেন একজন স্থায়ী সেক্রেটারী ( Permanent Secretary ) এবং তাঁর নীচে থাকেন একজন ডেপুটি সেক্রেটারী, নিম্ন সেক্রেটারী, সহায়ক সেক্রেটারী, অধ্যক্ষগণ এবং সহকারী অধ্যক্ষগণ। কার্যনির্বাহক কর্মচারীদের কাজ হল গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। করণিক স্তরের কাজ হল চিঠিপত্র, বিবরণী ইত্যাদি সংগ্রহ করা, হিসাব পরীক্ষা করা ইত্যাদি। শিল্প-দপ্তরের অন্তর্গত কর্মচারীদের সংখ্যা প্রচুর এবং প্রতি বৎসরেই বেড়ে চলেছে। ১৯৩৯ সালে এই দপ্তরভুক্ত কর্মীদের সংখ্যা ছিল ১,১২২, ১৯৪৬ সালে হয়েছিল ১,৪৩০ এবং ১৯৪৮ সালে হয়েছিল ২,১৩৯।

বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের পরিচালনার জন্য শিক্ষা দপ্তরের অনেকগুলি শাখা খোলা হয়েছে। যেমন, বিভিন্ন স্কুল স্তরের শিক্ষার পরিচালনার জন্য স্কুল শাখা ( School Branch ), বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য অধিকতর শিক্ষা শাখা ( Further Education Branch ), শিক্ষক শাখা, বিশেষ কার্যাবলী ( Special Services ) শাখা, পরিসংখ্যান বিভাগ, অর্থঘটিত শাখা ইত্যাদি। প্রতিটি শাখার শীর্ষে আছেন একজন করে আণ্ডার সেক্রেটারী।

**পরিদর্শক বিভাগ ( Inspectorial Section ) :** পরিদর্শকরা নিযুক্ত হন দেশের রাজা বা রাণীর দ্বারা, যদিও তাঁরা তাঁদের কাজের বিবরণী পেশ করেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। পরিদর্শকদের নির্বাচিত করেন একটি নির্বাচনী বোর্ড। এই বোর্ডে থাকেন মুখ্য পরিদর্শক এবং সিভিল সার্ভিস কমিশনের একজন প্রতিনিধি। সাধারণত শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গ্রাজুয়েটদেরই পরিদর্শকরূপে নির্বাচিত করা হয়।

পরিদর্শন বিভাগেরও গত কয়েক বৎসরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে। ১৯২২ সালে এটি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ, কারিগরী, মাধ্যমিক ও চিকিৎসাঘটিত শিক্ষা। ওয়েলসের পরিদর্শন ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। প্রত্যেকটি শাখার ভার ছিল একজন প্রধান পরিদর্শকের হাতে এবং সমস্ত মহিলা-পরিদর্শকদের উপরে ছিলেন একজন প্রধান মহিলা-পরিদর্শক।

এ ছাড়া প্রত্যেক শাখায় ১৭ জন করে সাধারণ পরিদর্শক ছিলেন। প্রাথমিক শাখায় সহকারী পরিদর্শকও ছিলেন সাহায্য করার জন্য।

১৯২২ সাল থেকে এই বিভাগের নানা পরিবর্তন দেখা দিতে সুরু করল। শিক্ষক-শিক্ষণ শাখাটি উঠিয়ে দেওয়া হল, এবং অন্যান্য শাখার প্রধানেরা একজন উচ্চতর প্রধান পরিদর্শকের অধীনস্থ হলেন। ১৯৩০ সালে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট শাখাটিও উঠে গেল। প্রথম প্রথম মহিলা পরিদর্শকদের যথেষ্ট সম্মান বা মূল্য দেওয়া হত না। ১৯৩৩ সালের আগে মাত্র একজন মহিলা জেলা পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর পর থেকে অনেক মহিলা পরিদর্শক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালে শিক্ষা-আইন অনুযায়ী এই দপ্তরটির কি ধরনের পরিবর্তন কর প্রয়োজন তা নির্ণয়ের জন্য শিক্ষাদপ্তর একটি বিভাগীয় কমিটি ( Departmental Committee ) নিযুক্ত করেন। সে সময়ে পরিদর্শকের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০। স্থির হল যে এই সংখ্যা বাড়ান দরকার এবং তার ফলে ১৯৪৬ সালে এই সংখ্যা হয় ৪২৪, ১৯৪৯এ ৫২৭, ১৯৫৪তে ৫৩৭ ইত্যাদি। তাছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখা দু'টির স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখার কোন কারণ পাওয়া গেল না। বর্তমান সংগঠনে ৬ জন মুখ্য পরিদর্শক আছেন একজন উচ্চতর মুখ্য পরিদর্শকের অধীনে। সাধারণ পরিদর্শকদের সংখ্যাও বাড়ান হয়েছে। সহকারী পরিদর্শকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম প্রথম পরিদর্শক বিভাগের কাজ ছিল কেবলমাত্র বরাদ্দ টাকা ঠিকমত ব্যয়িত হল কিনা তাই দেখা। এই দায়িত্বটি অবশ্য এখনও পরিদর্শকদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে পরিদর্শকদের কাজ দু' শ্রেণীর—পূর্ণ পরিদর্শন যার শেষে শিক্ষামন্ত্রীকে বিবরণী পেশ করতে হয় এবং নিয়মিত পরিদর্শন, যার কোন বিবরণী পেশ করতে হয় না। নিয়মিত পরিদর্শনের ক্ষেত্রে স্কুলটির বিশেষ দায়িত্ব পরিদর্শককে নিতে হয় কিন্তু পূর্ণ পরিদর্শনের বেলায় একটি জনমণ্ডলীর দ্বারা পরিদর্শন কাজটা করান হয় এবং পরিদর্শক সেই মণ্ডলীটির সভাপতিরূপে কাজ করেন। তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং পরিদর্শনের শেষে স্কুলের পরিচালকদের সঙ্গে দেখা করে পূর্ণ বিবরণী প্রস্তুত করেন। আগে পরিদর্শকের নামে স্কুলের শিক্ষকেরা ভয়ে কাঁপতেন। কিন্তু বর্তমান কালের পরিদর্শকের কাজ হল সত্যকারের

গুণগুলি দেখা, অবশ্যম্ভাবী দোষগুলি খুঁজে বার করা নয় এবং স্কুলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ সংযোগের ফলে তিনি যে মূল্যবান জ্ঞান লাভ করেছেন তারই জোরে শিক্ষকদের গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং সহায়তা করা। আর যদি তিনি মনে করেন যে জনসাধারণের অর্থ যথাযোগ্য ব্যয়িত হচ্ছে না তবে তার বিবরণ দেওয়া তাঁর প্রথম কর্তব্য হয়ে উঠবে।

পরিদর্শকদের আবার এক ধরনের প্রচারক বলেও বর্ণনা করা যায়। বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে সবচেয়ে ভাল শিক্ষামূলক চিন্তা এবং পদ্ধতিগুলি তাঁরা আয়ত্ত করে নেন এবং অন্যান্য স্কুলে সেগুলি ছড়িয়ে দেন। তাছাড়া তাঁদের অভিজ্ঞতা দেশের একস্থানে সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন স্থান থেকে অর্জিত। ফলে তাঁরা যা উপদেশ বা নির্দেশ দেন সেগুলি সব সময়েই তাঁদের নিজেদের সৃষ্ট নয়, নানা স্থান থেকে সযত্নে সংগৃহীত। এ ছাড়া শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য যে বহু সংগঠন তৈরী হয়েছে সেগুলিতে বক্তৃতা দেওয়া বা তাদের আলোচনায় নেতৃত্ব করার জন্যও পরিদর্শকদের চাহিদা বিরাট।

পরিদর্শকদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যে এঁরা মন্ত্রীদপ্তরের 'চোখ এবং কান'রূপে কাজ করে থাকেন। এঁরা সমস্ত দেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন বলে এবং প্রত্যেকে ছোট ছোট অঞ্চলের দায়িত্ব বহন করেন বলে এঁরা প্রত্যেকে নিজের স্কুলগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে, তাদের পরিচালক ও শাসকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্ধুভাবে আলাপ আলোচনা করতে এবং স্থানীয় রীতি নীতি ও জনমতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। কোন বিশেষ অঞ্চলে যদি এরা কোন প্রশংসনীয় প্রথা দেখেন বা কোন উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণমূলক প্রচেষ্টা দেখেন তবে তাঁরা যে কেবল সেগুলির খবর প্রশাসক দপ্তরে পৌছে দিতে পারেন তাই নয় সেই অভিনব প্রচেষ্টার এক সুবিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারেন এবং সেই প্রচেষ্টার পিছনে কি আশা এবং কল্পনা কাজ করছে তারও এক নিখুঁত ছবি কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির করতে পারেন।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিচালকগণ সব সময়েই স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহযোগে কাজ করে থাকেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিচালকদের নিজস্ব দায়িত্ব যে প্রচুর আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কখনও তাঁদের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজী না

হন তবে তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু দেখা গেছে যে বাস্তবক্ষেত্রে এ সবের কোন প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত সংযোগ, সরাসরি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ব্যাপারেই স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষেরা নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসায় এসে যান। আজকাল কোন প্রস্তাব মন্ত্রীদপ্তরে গিয়ে পৌছবার আগেই কেন্দ্রীয় বিভাগের পরিদর্শক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির ( সাধারণত প্রধান শিক্ষা-আধিকারিক ) মধ্যে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়ে থাকে। ফলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দুই বিভাগের মধ্যে মতান্তর হবার সম্ভাবনা থাকে না।

## ৮। স্থানীয় পরিশাসন

বিংশ শতাব্দীর আগে ইংলণ্ডের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন উল্লেখযোগ্য কোন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না, তেমনই কোন সুনির্দিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষও ছিল না। ১৮৩৩ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হলেও সমস্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিল জনহিতৈষী সংস্থা বা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি। ১৮৭০ সালে রাষ্ট্র প্রথম স্কুল স্থাপন করতে সুরু করে যদিও সেগুলির জন্য কোন সরকারী পরিচালক মণ্ডলী ছিল না। ১৮৭০ সালের পর থেকে স্কুলবোর্ড গঠনের রীতি প্রচলিত হয় কিন্তু তাও বাধ্যতামূলক ছিল না এবং বহু স্থলে শিক্ষাবোর্ড গঠিতই হয়নি।

বর্তমানে যাকে আমরা এল-ই-এ বলি সেগুলি ১৯০২'র শিক্ষা আইনের দ্বারা প্রথম সৃষ্ট হয়। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনটি পাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত এল-ই-এ'র সংগঠন ও ক্ষমতার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

### শিক্ষা আইন—১৯০২ঃ

১৯০২'র শিক্ষা আইনের দ্বারা দু' শ্রেণীর স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করা হয়। যথা—

(ক) কাউন্টি ( County ) এবং কাউন্টি বারোর (County borough) শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। এগুলিকে পার্ট টু ( Part II ) কর্তৃপক্ষ বলা হত।

(খ) মিউনিসিপ্যাল বারো এবং সহর অঞ্চল ( Urban district ) গুলির শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। এগুলিকে পার্ট থ্রি ( Part III ) কর্তৃপক্ষ বলা হত।

প্রথম শ্রেণীর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কাউন্টি এবং কাউন্টি বারোর সমিতিগুলির ( পার্ট টু ) হাতে স্থানীয় সকলপ্রকার শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল বারো এবং সহরাঞ্চলের সমিতিগুলির ( পার্ট থ্রি ) হাতে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

নিম্নতম ৫০,০০০ জনসংখ্যা না হলে কোন অঞ্চল কাউন্টি বারো বলে পরিগণিত হয় না। ১৯৫৪ সালের হিসেব অনুযায়ী সমগ্র ইংলণ্ডে মোট কাউন্টি বারো ছিল ৮৩টি, কাউন্টি ছিল ৬২টি। তেমনই কোন মিউ-

নিসিপ্যাল বারোর লোকসংখ্যা অন্তত ১০,০০০ এবং সহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা অন্তত ২০,০০০ না হলে তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বলে গণ্য করা হয় না। মিউনিসিপ্যাল বারো এবং সহরাঞ্চলের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬৯টিতে।

কিন্তু এই দু' ধরনের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থাকায় যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিল। ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই উন্নতধী ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চস্তরের শিক্ষা দানের নির্দেশ দেয় এবং ১৯২৭ সালে উপদেষ্টা সমিতি ( Consultative Committee ) এই উদ্দেশ্যে মডার্ন স্কুল নামে একধরনের নতুন স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মডার্ন স্কুলগুলি হবে মাধ্যমিক স্তরের এবং আইন অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল বারো এবং সহরাঞ্চলের শিক্ষাকর্তৃপক্ষের এই স্কুল চালাবার অধিকার নেই। ফলে এই প্রস্তাবটিকে কার্যে রূপ দেওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

## শিক্ষা আইন—১৯৪৪ ঃ

এই আইন অনুযায়ী এল-ই-এ বলতে রইল কেবলমাত্র কাউণ্টি কাউন্সিলগুলি এবং কাউণ্টিবারো কাউন্সিলগুলি। মিউনিসিপ্যাল বারো এবং আর্বান ডিষ্ট্রিক্টগুলিকে আগে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি কাউণ্টি কাউন্সিল ও কাউণ্টি বারো কাউন্সিলের হাতে উঠিয়ে দেওয়া হল। ফলে আগে যেখানে ৩১৫টি এল-ই-এ ছিল, তার জায়গায় হল ১৪৬টি। শিক্ষা ছাড়াও স্থানীয় লোকদের পথ, পার্ক, জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি অন্যান্য অনেক বিষয়ের দায়িত্বও বর্তমানে এল-ই-এ'র হাতে দেওয়া হয়েছে।

এল-ই-এ'র মধ্যে সদস্য থাকেন দু' শ্রেণীর অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলর। যে সকল কাউন্সিলর দীর্ঘ ও উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য খ্যাত তাদের মধ্যে থেকেই অল্ডারম্যান মনোনয়ন করা হয়, ফলে সেক্ষেত্রে নির্বাচনের কোন প্রয়োজন হয় না। প্রতি বৎসর এক তৃতীয়াংশ করে কাউন্সিলরের পদ খালি হয় এবং নতুন লোক দিয়ে সেই শূন্য আসনগুলি পূর্ণ করা হয়। যদি অবশ্য কোন কাউন্সিলর দ্বিতীয়বার প্রবেশপ্রার্থী হন তবে তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়।

কাউন্সিলের সদস্যেরা কাজ করে থাকেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে। আগে কাউন্সিলেররা কাউন্সিলের কাজ করার ব্যয়ও নিজেরা বহন করতেন। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যয়টা কাউন্সিল থেকে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন কাউন্সিলের আকার, পদ্ধতি, প্রথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ কাউন্সিলেরই সদস্য সংখ্যা খুব বেশী নয়। বড় বড় কাউন্সিলগুলি পার্লামেন্টের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়ে গেছল। শিক্ষাবোর্ডের জায়গায় তৈরী হল শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর। শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হল এবং নিজের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে শিক্ষা পরিচালনার কার্যকরী সম্পাদনার অধিকারও তাঁকে দেওয়া হল। অতএব দেখা যাচ্ছে ১৯৪৪ সালের পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যে ক্ষমতা ছিল কিছু পরিমাণে তা নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্কুচিত হল ১৯৪৪'র আইনটি পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

তেমনই আবার এল-ই-এ'র কার্যকরী সহযোগিতা পাবার উদ্দেশ্যে এল-ই-এ'র দায়িত্ব ও ক্ষমতাও আগে চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে যেগুলি নিছক অধিকার বা ক্ষমতা বলে পরিগণিত হত এখন সেগুলি কর্তব্যের পর্যায়ে উঠেছে। আগে অনেক ক্ষেত্রে আংশিক বা সঙ্কুচিত ক্ষমতা ছিল, এখন সে সব ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এল-ই-এ'র কাজের পরিধিও প্রচুর ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানের এল-ই-এ গুলি ব্যাপকতর ও অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুনরাবির্ভূত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ১৯০২'র আইন অনুযায়ী এল-ই-এ তার অধীনস্থ অঞ্চলের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করে যদি বাঞ্ছনীয় মনে করেন তবে শিক্ষা-বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই অঞ্চলের মাধ্যমিক ও অন্যান্য শিক্ষা ( প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া ) দেবার ব্যবস্থা করবেন বা তাতে সাহায্য করবেন। দেখা যাচ্ছে যে এই নির্দেশমত মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাটা এল-ই-এ'র পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়, কেননা যদি কোন অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাটা এল-ই-এ বাঞ্ছনীয় না মনে করেন তবে সেখানে ব্যবস্থা নাও করতে পারতেন। ১৯২১ সালের শিক্ষা আইনেও এই একই

নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া হল যে প্রত্যেক স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হল তার অধীনস্থ অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত স্কুলের ব্যবস্থা করা। তেমনই নার্সারি স্কুলের ক্ষেত্রে ১৯২১ সালের আইনের দ্বারা নার্সারি স্কুল তৈরী করা বা নার্সারি স্কুলকে সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা এল-ই-এ'কে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনে বলা হল যে ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাটা এল-ই-এ'র কর্তব্যের অঙ্গীভূত। আবার ১৯২১ সালের আইন অনুযায়ী এল-ই-এ প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের আহারের ব্যবস্থা করতেও পারতেন, না করতেও পারতেন কিন্তু ১৯৪৪'র আইনের দ্বারা যাতে এই পরিকল্পনাটি এল-ই-এ'র কর্তব্যভুক্ত হয় সেই মত নিয়মকানুন তৈরী করতে শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছিল। যেমন ১৯২১ সালের আইনের দ্বারা স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাটা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও সে ব্যাপারে অর্থব্যয় করতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। ১৯৪৪ সালের আইনে সে স্বাধীনতা দেওয়া হল। তেমনই মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজনের জন্য ব্যয় করার স্বাধীনতা এল-ই এ'র ইতিপূর্বে ছিল না। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা ঐ ব্যাপারেও স্বাধীনতা দেওয়া হল। তাছাড়া পিতামাতার অর্থব্যয় করার ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক ছেলেমেয়েদের দক্ষতা ও শক্তির বিচার করে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার পূর্ণ স্বাধীনতা এল-ই-এ'কে দেওয়া হয়েছে ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা।

১৯৪৪ সালের আইন এল-ই-এ'র কর্ম-পরিধির সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই আইনের নির্দেশ অনুযায়ী এল-ই-এ এখন বাধ্যতামূলক স্কুল বয়সের উপরের ব্যক্তিদের জন্য অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর অর্থ হল এল-ই-এ খেলার মাঠ, জিমনাসিয়াম, সন্তরণাগার ইত্যাদি স্থাপন করতে পারেন। তাছাড়া প্রয়োজন বোধে ছেলেমেয়েদের পোষাক সরবরাহ করা, গবেষণা করা, সম্মেলন আহ্বান করা ইত্যাদি নানা নতুন কর্তব্য এখন এল-ই-এ'র কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

**শিক্ষা-কমিটি ( Education Committee ):**

১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি এল-ই-এ'কেই একটি করে শিক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। এই শিক্ষা কমিটি এল-ই-এ'কে তার শিক্ষাগত কর্তব্যপালনে সাহায্য করবে। এই কমিটির সংগঠন শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই হবেন কাউন্সিলের সদস্য যদিও শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং স্থানীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন কয়েকজন ব্যক্তি অবশ্যই কমিটিতে থাকবেন। জরুরী অবস্থা ছাড়া প্রত্যেক এল-ই-এ শিক্ষাবিষয়ক কিছু করার আগে কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করবেন। এল-ই-এ প্রয়োজন বোধ করলে শিক্ষা কমিটির উপর কোন বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন, আবার কমিটিও এক বা বেশী সাব-কমিটি তৈরী করে তাদের উপর কাজের ভার দিতে পারেন। ১৯৪৪ সালের আইনে শিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উভয়ই স্কুলে সম্পন্ন হয় বলে এ দুটিকে সাধারণত একসঙ্গে ধরা হয়ে থাকে। অধিকতর শিক্ষা হল স্কুল ছাড়ার পর শিক্ষা। সেইজন্য শিক্ষাদপ্তরের দুটি ভাগ আছে, একটি স্কুল শাখা, অপরটি অধিকতর শিক্ষার শাখা। অধিকাংশ শিক্ষা-কমিটিও একই পন্থা অনুসরণ করেছে এবং দুটি বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের জন্য দুটি করে সাব-কমিটি গঠন করে থাকে, যথা, স্কুল পরিশাসন সাব-কমিটি ও অধিকতর শিক্ষা সাব-কমিটি। আবার অনেক শিক্ষা কমিটি শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার জন্য স্পেশাল সার্ভিস সাব-কমিটিও গঠন করে থাকে। এ ছাড়া নতুন প্রসার ও অগ্রগতির পরিকল্পনার জন্যও সাব-কমিটিও প্রায় গঠন করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কমিটি এবং স্থায়ী সাব-কমিটিগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানের জন্য অস্থায়ী বিশেষ সাব-কমিটিও গঠন করে থাকে।

কমিটির সব চেয়ে দায়িত্বশীল কর্মী হলেন এর চেয়ারম্যান, তারপর ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন স্থায়ী সাব-কমিটীর চেয়ারম্যানেরা। এঁরা সকলেই হলেন অবৈতনিক কর্মী। কমিটির বেতনভুক্ত কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতা-সম্পন্ন হলেন প্রধান শিক্ষা আধিকারিক ( Chief Education Officer )। আগে এই প্রধান শিক্ষা আধিকারিক নিয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন

ছিল না। ফলে নানা যোগ্যতা ও গুণ সম্পন্ন আধিকারিক দেখা যেত। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিটিকে যে সকল ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে তাঁরা শিক্ষা আধিকারিক নিযুক্ত করতে চান তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিবরণ সহ একটি তালিকা শিক্ষা দপ্তরের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। এর ফলে উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতা ছাড়া প্রধান শিক্ষা আধিকারিক নিয়োগ করা এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

প্রধান শিক্ষা আধিকারিকের কাজ হল তাঁর কমিটির কাছে সিদ্ধান্তের জন্য বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপিত করা, সেগুলি সম্বন্ধে কমিটির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা। বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী উপদেশ দেওয়াও প্রধান শিক্ষা আধিকারিকের কাজের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য শিক্ষা বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকাটা প্রধান শিক্ষা আধিকারিকের একটা অপরিহার্য গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় বড় এল-ই-এ'র প্রধান শিক্ষা আধিকারিকের কাজের পরিমাণ প্রচুর। সেইজন্য অধিকাংশ প্রধান শিক্ষা আধিকারিকের অধীনেই প্রধান সহকারী (এদের ডেপুটি বলা হয়), বিভিন্ন কাজের শাখার ভারপ্রাপ্ত সহকারী এবং একাধিক পরিদর্শক থেকে থাকে।

অনেক কাউন্টিতে বিভাগীয় কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠান (Divisional Executive) বলে আরও একটি শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্থা গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বহু কাজ সম্পাদনের ভার এদের উপর দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত বিভাগীয় কার্য নির্বাহক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা বেতনভুক ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত কার্যনির্বাহ করে থাকেন। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষক নিয়োগ, নতুন স্কুলস্থাপনার ব্যবস্থা করা, ছেলেমেয়েদের পরিবহনের আয়োজন করা ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই বিভাগীয় কার্যনির্বাহক সংস্থার দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই সংস্থাটিকে তার কর্মসম্পাদনার সময় দুটি বিষয়ের উপর মনোযোগ রাখতে হয়, প্রথম, এল-ই-এ'র সাধারণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখা, দ্বিতীয়, স্থানীয় স্কুলের পরিচালক (Governor) ও ব্যবস্থাপকদের (Manager) মতামতের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া।

অনেক ক্ষেত্রে এল-ই-এ এবং বিভাগীয় কার্যানির্বাহক সংস্থার মধ্যে যথেষ্ট পারস্পারিক সহযোগিতা ও ঐক্য বজায় রেখে কাজ করতে দেখা গেছে। ফলে সে সব অঞ্চলে শিক্ষার সমস্যাগুলির সুসমঞ্জস ও সুষ্ঠু সমাধান হয়ে থাকে এবং যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাকার্য নির্বাহ হয়। কিন্তু তেমনই আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এল-ই-এ এবং বিভাগীয় কার্যনির্বাহক সংস্থার মধ্যে মতভেদ হতে দেখা গেছে যার ফলে সেখানে শিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধান আরও দুরূহ হয়ে পড়ে।

## ৯। ভলাণ্টারি স্কুল

ইংলণ্ডের প্রচলিত স্কুলব্যবস্থার একটা বড় বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটি হল সরকারী ও বে-সরকারী দু-ধরনের স্কুলেরই পাশাপাশি অবস্থিতি। সরকারী স্কুল বলতে সে সব স্কুলকে বোঝায় যেগুলি এল-ই-এ'র প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও পরিপোষিত। এগুলিকে বর্তমানে কাউণ্টি স্কুল এবং কাউণ্টি বারো স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আর এক শ্রেণীর স্কুল দেখতে পাওয়া যাবে যেগুলি এল-ই-এ'র দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং আংশিক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও সেগুলি এল-ই-এ'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সেগুলির উপর বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কম বেশী ক্ষমতা আছে। এগুলিকে ভলাণ্টারি ( Voluntary ) বা স্বতঃস্ফূর্ত স্কুল বলা হয়। বর্তমানে ভলাণ্টারি স্কুল তিন শ্রেণীর ; (১) এডেড ( Aided ) বা সাহায্যপ্রাপ্ত, (২) কনট্রোলড্ ( Controlled ) বা নিয়ন্ত্রিত ও (৩) স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেণ্ট ( Special Arrangement ) বা বিশেষ চুক্তিসম্পন্ন। এগুলির পরিচালকমণ্ডলীতে এল-ই-এ'র নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলেও প্রতিষ্ঠাতাদের তরফ থেকেও কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবেন। তবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকদের অনুপাত বিভিন্ন ভলাণ্টারি স্কুলের বেলায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন কনট্রোলড্ বা নিয়ন্ত্রিত স্কুলের ক্ষেত্রে মোট পরিচালকদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ এল-ই-এ'র, এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতিনিধি থাকবে। এডেড্ বা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বিশেষ চুক্তিসম্পন্ন ( Special Arrangement ) স্কুলের ক্ষেত্রে এল-ই-এ'র প্রতিনিধির এক তৃতীয়াংশ ও প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতিনিধির দুই তৃতীয়াংশ থাকবে। এই ভলাণ্টারি স্কুলগুলির ক্ষেত্রে নানারকম বিভিন্ন নিয়মকানুনও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভলাণ্টারি স্কুলের ব্যবস্থাপকরাই শিক্ষক নিযুক্ত ও বরখাস্ত করে থাকেন। আবার কখনও কখনও এল-ই-এ ব্যবস্থাপকদের পরামর্শক্রমে শিক্ষক নিয়োগ করে থাকেন।

এই সব জটিল নিয়মকানুনের মূলে আছে ধর্মমূলক শিক্ষার জন্য নানারকমের প্রয়োজনীয়তা। কোন কোন স্কুলে সাম্প্রদায়িক ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। আবার কোন কোন স্কুলে সপ্তাহে দুদিন সাম্প্রদায়িক ধর্ম

সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া চলবে। আবার এমনও স্কুল আছে যেখানে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দৈনিকই দেওয়া হয়ে থাকে। স্কুল পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে পরস্পরবিরোধী মতবাদ দেখা দিয়েছিল তার স্বাভাবিক ফল স্বরূপই দেখা দিয়েছে এই বিভিন্ন ও জটিল ব্যবস্থা ও আয়োজন।

ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি অবস্থিতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বেসরকারী প্রচেষ্টা বলতে প্রধানত বোঝায় ইংলণ্ডের চার্চ বা ধর্মায়তন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলগুলি। প্রথমদিকে চার্চ প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা ছিল বেশী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা ছিল কম। এখন তার বিপরীতটা সম্ভব হয়েছে। এল-ই-এ'র প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা চার্চের স্কুলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাছাড়া চার্চের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের আর্থিক ও পরিচালনামূলক দায়িত্বের অনেকখানি এখন এল-ই-এ'ই বহন করে থাকে। ১৮৩৩ সালে রাষ্ট্র প্রথম শিক্ষার খাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করে। তখনও পর্যন্ত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোন স্কুল হয় নি। ১৮৭০ সালে স্কুল বোর্ড তৈরী হল এবং সেই সময় থেকেই শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রথম হস্তক্ষেপের সুরু হল। ইতিপূর্বে স্কুলে ধর্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে কোনরূপই বাধা ধরা আইন ছিল না। ১৮৭০ সালের আইনে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত অঙ্গীভূত করা হয়। যথা, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সূচক এমন কোন ধর্মমূলক প্রশ্নোত্তর বা ধর্মমূলক বিধান স্কুলে শেখান হবে না। কাউপার-টেম্পল এই সর্তটির স্রষ্টা বলে সর্তটি কাউপার-টেম্পল সর্ত (Cowper-Temple Clause) নামে খ্যাত। তার ফলে বাইবেল পড়ান হত কিন্তু তার ব্যাখ্যা করা হত না। সম্প্রদায়মূলক ধর্মশিক্ষা দেয় এমন স্কুলগুলি সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেলেও জনসাধারণের প্রদত্ত কর থেকে তারা কোন সাহায্য পাবে না।

১৮৭০ সালের আইনের ফলে ভলাণ্টারি স্কুলের পাশাপাশি বোর্ডস্কুল তৈরী হল। বোর্ডস্কুলে কোনরূপ সম্প্রদায়মূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত না এবং সরকারী অর্থসাহায্য ও জনগণ প্রদত্ত করের দ্বারা এই স্কুলগুলি চলত।

স্কুল পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভলাণ্টারি ও বোর্ড উভয় প্রকার স্কুলকেই অর্থসাহায্য দেওয়া হত। যেটা ঘাটতি পড়ত ভলাণ্টারি

স্কুলকে তা মেটাতে হত চার্চের অর্থ-সাহায্য থেকে; আর বোর্ডস্কুলকে তা মেটাতে হত জনসাধারণের প্রদত্ত কর হতে। প্রথম প্রথম ভলাণ্টারি স্কুলগুলির খুব অসুবিধা হত না, কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো ছাত্র পিছু খরচের হার যেতে লাগল বেড়ে, ফলে ভলাণ্টারি স্কুলগুলির পক্ষে সে খরচ মেটানো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বোর্ডস্কুলের পক্ষে এই বর্ধিত ব্যয় বহন করা মোটেই শক্ত হল না।

১৯০২ সালে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা হল। এখন থেকে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলেরই পরিচালনার দায়িত্ব এল-ই-এ'র উপর দেওয়া হল। ভলাণ্টারি প্রাথমিক স্কুলগুলিও জনগণের প্রদত্ত করের অংশ পাবার অধিকারী হল। চার্চের দায়িত্ব হল কেবলমাত্র স্কুলবাড়ী যোগান। এই আইনটি কিন্তু বহু নাগরিক ভালভাবে নেন নি এবং অনেকেই প্রতিবাদরূপে করদান বন্ধ করেছিলেন।

১৯০২'র আইনের ফলে ভলাণ্টারি স্কুলের ব্যবস্থাপকেরা স্কুলের বাড়ীর ব্যবস্থা করবেন এবং মেরামতের ভার নেবেন। তার পরিবর্তে তাঁরা এল-ই-এ'র সম্মতিক্রমে শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবেন। স্কুলে প্রত্যহ সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে এবং পরিচালক সমিতিতে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতিনিধি থাকবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং এল-ই-এ'র প্রতিনিধি এক-তৃতীয়াংশ। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় অসুবিধা দেখা দিল স্কুল বাড়ী নিয়ে। অধিকাংশ ভলাণ্টারি স্কুলের বাড়ী ছিল পুরোনো এবং যখন সেগুলির মেরামতের দরকার দেখা দিল তখন ব্যবস্থাপকেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন। ফলে এল-ই-এ'রা পড়লেন উভয় সঙ্কটে। তাঁরা স্কুল বন্ধ করতেও পারেন না, অথচ ঐ রকম অনুপযোগী বাড়ীতে স্কুল চালানোও অনুচিত। ১৯২৪ সালে দেখা যায় মোট ভলাণ্টারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ৭৫৩টি, অথচ তার মধ্যে ৫৪১টিরই স্কুলবাড়ি ছিল অনুপযোগী, কিন্তু তাদের উপযোগী করে তোলার কোনই প্রচেষ্টা ব্যবস্থাপকদের ছিল না।

১৯১৮'র শিক্ষা আইন এবং ১৯২৬ সালে উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্টের ফলে স্থির হল যে প্রাপ্তযৌবনদের সেণ্ট্রাল বা সিনিয়র স্কুলে (যেগুলিকে তাঁরা মডার্ন নাম দিলেন) প্রয়োগধর্মী ও উন্নত পাঠক্রম অনুযায়ী পড়ানো হবে। ১৯২৮ সালে শিক্ষাবোর্ড হ্যাডো কমিশনের নির্দেশগুলি গ্রহণ করলেন এবং

১১ বছরের উপরের ছেলেমেয়েদের জন্য মডার্ন স্কুল খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এর জন্য পুরোনো স্কুল বাড়ীগুলিকে হয় ভাল করে মেরামত করতে হবে, নয় নতুন স্কুলবাড়ী তৈরী করতে হবে। কিন্তু কোন ভলাণ্টারি স্কুলেরই বাড়ী মডার্ন স্কুল খোলার উপযোগী ছিল না কিংবা কোন ভলাণ্টারি স্কুলের কর্তৃপক্ষ নতুন বাড়ী তৈরী করতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে প্রস্তাবিত মডার্ন স্কুল খোলার পথে বিরাট অন্তরায় দেখা দিল।

১৯৩৬ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা এই সমস্যাটির কিছুটা সমাধান করা হল। বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলের বাড়ী তৈরীর মোট ব্যয়ের ৭৫% এল-ই-এ ভলাণ্টারি স্কুলের ম্যানেজারদের দিতে পারবেন। কিন্তু তার বিনিময়ে ম্যানেজারদের তাঁদের অধিকারের কিছুটা অংশ ছাড়তে হবে, যেমন, ম্যানেজারেরা আর শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন না। সম্প্রদায়মূলক ধর্ম-শিক্ষাদান যদিও সংরক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা দেওয়া যাবে, কিন্তু কোন অভিভাবক যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর ছেলেমেয়েরা একটি অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা পেতে পারবে।

১৯৪৪ সালের আইনে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ভলাণ্টারি স্কুলগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কনট্রোলড্ বা নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিতে শিক্ষাদপ্তর প্রয়োজন মত স্কুলবাড়ীকে উপযোগী করে তোলার জন্য যে কোন খরচই করতে পারেন। আর এডেড্ বা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্পেশাল এ্যারেঞ্জমেণ্ট বা বিশেষ চুক্তিসম্পন্ন স্কুলগুলিতে অর্ধেক খরচ শিক্ষাদপ্তরের এবং অর্ধেক স্কুলের।

ভলাণ্টারি স্কুলের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের আর্থিক দায়িত্ব একটু একটু করে রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বিনিময়ে ভলাণ্টারি স্কুলকে অধিকার ত্যাগ করতে হয়েছে। কন্ট্রোলড্ বা নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলি সাহায্য সবচেয়ে বেশী নেয়, ফলে তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশী ছাড়তে হয়েছে। এডেড্ এবং স্পেশাল এ্যারেঞ্জমেণ্ট স্কুলগুলি সাহায্য যেমন কম নিয়েছে অধিকারও তেমন কম ছেড়েছে। ভলাণ্টারি কনট্রোলড্ স্কুলের পরিচালনার সমস্ত খরচই এল-ই-এ'কে বহন করতে হয়। তারা সপ্তাহে দু'দিন করে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দিতে পারে। এডেড্ ও স্পেশাল এ্যারেঞ্জমেণ্ট স্কুলগুলি তাদের বাড়ী বাবদ খরচার অর্ধেক মাত্র পায়।

সেজন্য তারা প্রত্যহই সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা দিতে পারে। মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ভলাণ্টারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং কম হোক বেশী হোক সমস্ত ভলাণ্টারি স্কুলই এই অধিকারটুকুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

বিংশ শতকের স্থরুতে প্রাথমিক স্কুলের চারভাগের তিনভাগই ছিল ভলাণ্টারি স্কুল। ১৯৩৮ সালে ভলাণ্টারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০,৫৩৩, এল-ই-এ'র স্কুল ছিল ১০,৫৬৩। ১৯৪৭ সালে কাউন্টি স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬,৫২০ এবং ভলাণ্টারি স্কুলের সংখ্যা ১১,৬২৫। এর পর এল-ই-এ স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৫১ সালে কাউন্টি স্কুলের সংখ্যা হয়েছিল ১৬,৮৪৬ এবং ভলাণ্টারি স্কুলের সংখ্যা কমে ১১,১০৭ তে নেমে ছিল। ১৯৫৩ সালে কাউন্টি স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ১৭,৪৫২ হয়েছিল, ভলাণ্টারি স্কুলের সংখ্যা আরও কমে ১০,৮৯৩ তে দাঁড়িয়েছিল।

## ১০। স্বাধীন স্কুল

১৯৪৪ সালের আইনে স্বাধীন ( Independent ) স্কুল বলে একটা নামের প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বাধীন স্কুল বলতে আইনটিতে বোঝান হয়েছে সেই সব স্কুলকে যেগুলিতে পাঁচ কিংবা তার বেশী সংখ্যক বাধ্যতামূলক স্কুল-বয়সের ছেলেমেয়েদের পূর্ণকালীন শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে অথচ যেগুলি কোন এল-ই-এ'র দ্বারা পরিপোষিত নয় কিংবা যাদের সত্বাধিকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে কোন অর্থসাহায্য পায় না।

এ শ্রেণীর অন্তর্গত স্কুলগুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, প্রাইভেট স্কুল, পাব্লিক স্কুল, প্রিপ্যারেটরি স্কুল এবং কিছু কিছু মেয়েদের স্কুল। পাব্লিক স্কুল বলতে ইংলণ্ডের এক বিশেষ ধরনের স্কুলকে বোঝায়। আর প্রিপ্যারেটরি স্কুল হল সেই সব স্কুল যেগুলিতে ছেলেমেয়েদের পাব্লিক স্কুলের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই পাব্লিক স্কুল এবং প্রিপ্যারেটরি স্কুলকে বাদ দিলে স্বাধীন স্কুলের পর্যায়ে পড়ে আর যত স্কুল, সকলকেই প্রাইভেট স্কুল নাম দেওয়া যেতে পারে। স্বাধীন স্কুলগুলির মধ্যে এমন অনেক স্কুল আছে যেগুলি এল-ই-এ'র দ্বারা পরিদর্শিত হতে চায়, যাতে তারা অনুমোদিত বিদ্যালয় বলে পরিচিত হতে পারে। আবার এমন স্কুলও আছে যারা এল-ই-এ'র পরিদর্শনকে সযত্নে এড়িয়ে যায় এবং অনুমোদন পাবারও কোন ইচ্ছা রাখে না।

১৯৪৯ সালের শিক্ষাদপ্তরের একটা হিসেবে দেখা যায় যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের পরিদর্শনের বাইরে স্বাধীনস্কুলের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি। এখন প্রশ্ন হল যে ইংলণ্ডে সর্বজনীন অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা এত কেন। এর একটা কারণ হল যে ইংলণ্ডে প্রবর্তিত মডার্ন স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের বেশ আস্থার অভাব আছে। যে সব পিতামাতা ছেলেমেয়েদের গ্রামার স্কুলে পাঠাতে অভিলাষী অথচ গ্রামার স্কুলে আসন সংগ্রহ করতে পারেন না সেই সব পিতামাতাদের অনেকে মডার্ন স্কুলে ছেলেমেয়েদের না পাঠিয়ে প্রাইভেট স্কুলে পাঠিয়ে থাকেন। অবশ্য মডার্ন স্কুলে অনুসৃত পাঠক্রমের ব্যাপকতা যত

বৃদ্ধি পাবে তত অভিভাবকদের মডার্ন স্কুলের উপর অনাস্থা কমে আসবে এবং প্রাইভেট স্কুলেরও প্রয়োজনীয়তা তখন হ্রাস পাবে।

প্রকৃতি ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে প্রাইভেট স্কুলগুলি নানা শ্রেণীর দেখতে পাওয়া যায়। এমন অনেক প্রাইভেট স্কুল আছে যেগুলি আধুনিক শিক্ষানীতি বা শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা চালানর জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ফলে স্বভাবতই এল-ই-এ'র ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত হতে তারা চায় না। আবার তেমনই অনেক প্রাইভেট স্কুল আছে যেগুলি এল-ই-এ'র নির্ধারিত সর্তগুলি পুরণ করতে অক্ষম এবং সেইজন্য তারা পরিদর্শনকে স্বভাবতই এড়িয়ে যায়।

**পাব্লিক স্কুল ( Public School ) ঃ**

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পাব্লিক স্কুলগুলিও স্বাধীনস্কুলের পর্যায়ে পড়ে। পাব্লিক স্কুল কাকে বলে তার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বহুদিনের প্রচলিত কতকগুলি স্কুল তাদের নিজস্ব শিক্ষণ বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে অন্যান্য স্কুলগুলি থেকে একটা পৃথক শ্রেণীরূপে গড়ে উঠে। আজ তারা পাব্লিক স্কুল নামে পরিচিত। অধিকাংশ পাব্লিকস্কুলই বহু পুরাতন ঐতিহ্যপূর্ণ স্কুল, তবে অপেক্ষাকৃত নতুন স্কুলও অনেক আছে। 'উইনচেষ্টার' পাব্লিকস্কুলটি স্থাপিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এবং 'ইটন' পঞ্চদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীতেও বেশ কতকগুলি পাব্লিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমান শতাব্দীতেও কিছু কিছু নতুন পাব্লিক স্কুল গঠিত হয়েছে।

বেশীর ভাগ পাব্লিক স্কুলই আবাসিক, যেমন, রাগবি, হ্যারো ইত্যাদি। তেমনই আবাসিক নয় এমন পাব্লিক স্কুলও আছে যেমন সেণ্ট পলস্, মারচেণ্ট টেলরস্ ইত্যাদি। সাধারণ স্কুলের চেয়ে পাব্লিক স্কুলের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় অনেক বেশী। আবার অনেক পাব্লিকস্কুল আছে যেগুলি রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে থাকে। এগুলিকে আইনসম্মতভাবে স্বাধীন স্কুল বলা চলে না। ফলে দেখা যাচ্ছে পাব্লিকস্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করা যায় না। তবে প্রাচীনতা, আবাসিকতা, ব্যয়বহুলতা ও স্বাধীনতা এই চারটি বৈশিষ্ট্য সাধারণত পাব্লিক স্কুলে পাওয়া যায় বলা যেতে

পারে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে পাব্লিকস্কুলগুলি প্রাচীন গ্রামার স্কুল থেকেই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে। এগুলির "পাব্লিক" নাম হবার কারণ হল এই যে প্রাচীন স্কুলগুলি প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পড়ানোর উদ্দেশ্যে ধনী ও সদাশয় ব্যক্তিদের দ্বারা পাব্লিক বা জনসাধারণের স্কুলরূপে সৃষ্ট হয়েছিল। প্রথম প্রথম এগুলি অবৈতনিক বা স্বল্প-বৈতনিক স্কুলরূপে চলত, পরে ধীরে ধীরে এগুলির প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এগুলি এক বিশেষ ধরনের আবাসিক ব্যয়বহুল স্কুলে পরিণত হয়। কিন্তু 'পাব্লিক' কথাটি নামের সঙ্গে প্রথম থেকেই যেমন সংযুক্ত ছিল তেমনই রয়ে যায়।

প্রসিদ্ধ পাব্লিক স্কুলগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন হল উইনচেষ্টার। (Winchester)। উইকেহামের (Wykeham) উইলিয়াম ১৩৮২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৪৪০ সালে ষষ্ঠ হেনরী ইটন (Eton) স্থাপিত করেন। যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বেশ কতকগুলি পাব্লিক স্কুল স্থাপিত হয়, যেমন ওয়েষ্টমিন্ষ্টার (১৫২০), সেণ্টপলস্ (১৫১২), মার্চেণ্ট টেলরস্ (১৫৬১), ক্রায়েষ্টস্ হসপিটাল (১৫৫৩) ও চার্টারহাউস (১৬১১)। এই সময় বহু গ্রামার স্কুল ধীরে ধীরে পাব্লিক স্কুলের পর্যায়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট পরিচালক বা প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষকের প্রভাবের ফলেই সাধারণ গ্রামার স্কুল থেকে পাব্লিক স্কুলের স্তরে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। যেমন হ্যারো ১৫৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ গ্রামার স্কুল হিসেবে। ১৭১৩ সালে ডিউক অফ চাণ্ডোস এর পরিচালক হন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় হ্যারো পাব্লিকস্কুলের স্তরে উন্নীত হয়। তেমনই ১৭৭৭ সালে টমাস্ জেম্স্ রাগবির প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তাঁর কর্মনিপুণতায় রাগবিও পাব্লিকস্কুলের পর্যায়ে উঠে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের পাব্লিকস্কুলের ইতিহাসে এক সঙ্কটময় কাল দেখা দেয়। এই সময়েই পাব্লিকস্কুলগুলি সাধারণ গ্রামার স্কুল থেকে বেশ স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন এক বিশেষ ধরনের স্কুলে পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ কতকগুলি গুরুতর গলদের জন্য সেগুলি জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠে। সমালোচনার বিষয়বস্তু হল পাব্লিকস্কুলের গতানুগতিক পাঠক্রম, আবাসী ছাত্রদের জীবন যাপনের অতি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের মধ্যে চরম শৃঙ্খলাহীনতা। এই সময় পাব্লিক স্কুলগুলির বিরুদ্ধে

আন্দোলন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে তাদের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময়েই কয়েকজন খ্যাতনামা প্রধানশিক্ষকের আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের নতুন আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় পাব্লিক স্কুলগুলি তাদের গৌরব ফিরে পায়। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রথমে নাম করতে হয় প্রসিদ্ধ কবি ম্যাথ আর্নল্ডের পিতা টমাস আর্নল্ডের। ইনি ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত রাগবির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি পাব্লিক স্কুলগুলির সমস্ত দোষত্রুটি দূর করবার উদ্দেশ্যে নানারূপ সংস্কার সাধন করলেন। আর্নল্ড প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেগুলিকে নতুনভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করলেন। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল, নীতিবিদ্যা এবং রাষ্ট্রনীতি শেখাতে সুরু করলেন। তিনি পাঠক্রমেরও প্রচুর সংস্কার করলেন। তাঁর প্রবর্তিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফরাসী ভাষা, জার্মান ভাষা, গণিত এবং আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস। আর্নল্ড স্কুলে স্বতন্ত্র 'হাউস' ( House ) প্রথা* প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর নিজের স্কুলে বিভিন্ন 'হাউস' বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে ছাত্রদের আবাসিক জীবন অনেক উন্নত হয়ে উঠল।

পাব্লিক স্কুলে আর্নল্ড নীতিগত আদর্শের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ধর্মমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের এক নতুন আদর্শ আর্নল্ড পাব্লিক স্কুলগুলির সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। এবং তাঁর সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় বহু পাব্লিকস্কুলের নৈতিক মান বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল। এই সময় আর্নল্ড ছাড়াও আরও কয়েকজন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষককে পাব্লিক-স্কুলের ভার নিতে দেখা যায়। শ্রুজ্‌বারি ( Shrewsbury ) পাব্লিক স্কুলে স্যামুয়েল বাট্‌লার ১৭৯৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন এবং সেখানে বহু প্রগতিশীল পরিবর্তন এনেছিলেন। এইসব প্রধান শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নতুন

* 'হাউস' প্রথা বলতে বোঝায় যে আবাসী ছাত্রদের কয়েকটি বিভিন্ন বাড়ীতে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকটি হাউস বা বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার থাকে একজন করে শিক্ষকের হাতে এবং সেই শিক্ষক তাঁর হাউসের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দায়ী থাকেন।

নতুন পাব্লিকস্কুল সৃষ্টি হতে সুরু করল। ১৮৪১ সালে তৈরী হল, চেলট্যেনহাম্ ( Cheltenham ), ১৮৪৩ সালে মার্লবারো ( Marlborough ), ১৮৫২ সালে ওয়েলিংটন্ ( Wellington ) এবং ১৮৬২ সালে ক্লিফটন্ (Clifton), ম্যালভার্ণ ( Malvern ), এবং হেলেবারি ( Haileybury )। এছাড়া আরও অনেকগুলি স্কুল এই সময় গঠিত হয়।

১৮৬১ সালে ইটন, উইনচেস্টার, ওয়েষ্টমিন্সটার, চার্টার হাউস, সেণ্ট পলস্, মার্চেণ্ট টেলার্স, হ্যারো, রাগবি এবং স্রুজবেরি—এই নয়টি পাব্লিকস্কুলের "আয়" এবং "পরিচালনা" সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য ক্লারেনডন কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পাব্লিকস্কুল আইন পাশ হয়। ১৮৬৯ সালে বাকী পুরানো গ্রামার স্কুলগুলির জন্য এন্ডাউড স্কুলস্ অ্যাক্ট পাশ হয়। দেখা যাচ্ছে যে কমিশন মাত্র নয়টি স্কুলকেই পাব্লিক স্কুল বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের জন্য সরকার বিশেষ আইন তৈরী করেছেন। কিন্তু এর ফলে অন্যান্য পাব্লিক স্কুলগুলির মধ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দেয় এবং আপিংহাম ( Uppinghum ) নামক পাব্লিকস্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক এডওয়ার্ড থ্রিং ( Edward Thring ) একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং তার ফলে ১৮৬৯ সালে প্রধানশিক্ষক সম্মেলন ( Headmasters' Conference ) গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাব্লিকস্কুলের প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। বহু খ্যাতনামা ও বিদ্বান্ ব্যক্তি পাব্লিকস্কুলের প্রধানশিক্ষকের আসন ভূষিত করেন। যেমন আপিংহামে এডওয়ার্ড থ্রিং, হ্যারোয় স্যামুয়েল বাট্‌লার, চার্টার হাউসে হেগ-ব্রাউন ইত্যাদি। আউণ্ডলের ( Oundle ) প্রধানশিক্ষক স্যাণ্ডারসন পাব্লিকস্কুলে প্রথম কর্মশালা ( Workshop ) স্থাপন করেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে পাব্লিকস্কুলগুলির বিরুদ্ধে এক নতুন সমালোচনা শোনা যেতে লাগল। এই সময়ে গণতন্ত্রের আদর্শ ও সামাজিক সাম্য-বোধ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। পাব্লিকস্কুল থেকে যে সব ছাত্র পাঠ সাঙ্গ করে বেরোয় তারা সমাজের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারে না। তাদের বিশেষধর্মী ও উন্নত শিক্ষা, নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা ও কৃত্রিম মর্যাদাবোধ তাদের জনসমাজ থেকে

একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ শ্রেণীরূপে পৃথক করে রাখে। ফলে পাব্লিকস্কুলের শিক্ষা গণতন্ত্র ও সাম্যের আদর্শের বিরোধী বলে পরিগণিত হল।

বস্তুত এই কারণের জন্যই ১৯৪২ সালে ফ্লেমিং কমিটি নিযুক্ত করা হয়। সরকার উপলব্ধি করলেন যে রাষ্ট্র-সংগঠিত ও রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষার মাধ্যমগুলির সঙ্গে পাব্লিকস্কুলের কোন যোগাযোগ নেই। সরকার পরিচালিত প্রাথমিক স্কুল থেকে ছাত্রেরা পাব্লিকস্কুলে ঢুকতে পারে না। পাব্লিকস্কুলের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রিপ্যারেটরি স্কুল নামে এক বিশেষ ধরনের স্কুল আছে এবং সেখান থেকে যারা সাফল্যের সঙ্গে পাশ করে বেরোয় তারাই পাব্লিকস্কুলে আসন পাবার অধিকারী হয়। এ-ছাড়া পাব্লিকস্কুলের মাসিক বেতনের হার এতই বেশী যে সাধারণ আয়-সম্পন্ন পিতামাতার পক্ষে এই সব স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ানো একরূপ অসম্ভব বললেই চলে। এই সব কারণে পাব্লিকস্কুল ইংলণ্ডের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার গণ্ডীর বাইরে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পন্ন বিশেষধর্মী শিক্ষার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফ্লেমিং কমিশনের প্রধান দ্রষ্টব্য হল কেমন করে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম-গুলির সঙ্গে পাব্লিকস্কুলগুলির আরও নিকট যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং কেমন করেই বা সাধারণ পিতামাতার ছেলেমেয়েদের পক্ষে পাব্লিকস্কুলকে প্রবেশযোগ্য করে তোলা যায়।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পাব্লিকস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ডের সরকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের একমাত্র সমস্যা হল কেমন করে সেই শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন। বস্তুতঃ পাব্লিকস্কুলগুলির বিরুদ্ধে যা অভিযোগই থাকুক না কেন তাদের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, সুসংস্কৃত পাঠক্রম, সুদক্ষ শিক্ষক-মণ্ডলী ও ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পাব্লিকস্কুলের শিক্ষাকে সাধারণ স্কুলের শিক্ষার চেয়ে অনেক উন্নত ও কার্যকরী করে তুলেছিল সে বিষয়ে কেউই দ্বিমত ছিলেন না।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাবলম্বন, বিশ্বস্ততা, সাহস, সমাজপ্রিয়তা প্রভৃতি বাঞ্ছনীয় গুণগুলি আহরণ করতে পাব্লিকস্কুলের ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হয়। পাব্লিকস্কুলে প্রচলিত কতকগুলি প্রথারও শিক্ষামূলক কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলে একমত ছিলেন, যেমন হাউস সিষ্টেম অর্থাৎ

ছাত্রদের কতকগুলি বিভিন্ন হাউস বা বাড়িতে বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা, প্রিফেক্ট সিষ্টেম, অর্থাৎ ছাত্র-পরিচালক নিযুক্ত করা ইত্যাদি। ধর্মমূলক শিক্ষার প্রাধান্য ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাও পাব্লিক-স্কুলের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য। সবশেষে অধিকাংশ পাব্লিকস্কুলই ছিল আবাসিক স্কুল এবং এবং সরকার থেকে স্থরু করে পিতামাতা ও শিক্ষাবিদেরা সকলেই আবাসিক স্কুলের শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন। এক কথায় পাব্লিক-স্কুলের শিক্ষার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এমন কি ইংলণ্ডের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পন্ন উচ্চ পদে যাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের মধ্যে বেশ একটা বড় অংশ ছিল পাব্লিকস্কুলের ছাত্র। ১৯৩৯ সালে ওয়ার্কার্স এডুকেশানাল এসোসিয়েসনের একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে মোট ৮৩০ জন বিশপ, ডীন, বিচারপতি, উচ্চবেতনভুক সরকারী কর্মচারী, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী, অধীনস্থ রাজ্যের রাজ্যপাল, ব্যাঙ্ক-রেলকোম্পানীর ডিরেক্টার ইত্যাদির মধ্যে ৬৩৬ জন অর্থাৎ মোট শতকরা ৭৫ জনই পাব্লিকস্কুল থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন পিতামাতাদের ছেলেমেয়েরা ছাড়া অন্য কেউ পাব্লিকস্কুলের আবাসিক ছাত্র হতে পারত না। অতএব সাধারণ পিতামাতার ছেলেরাও যাতে এই স্থযোগ ভোগ করতে পারে তার উপায় নিরূপণ করাও ফ্লেমিং কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের প্রচেষ্টা হল কেমন করে এই শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক করে তোলা যায়। তাঁরা দুটি পরিকল্পনা দিয়ে-ছিলেন, যথা 'ক' পরিকল্পনা (Scheme A) এবং 'খ' (Scheme B) পরিকল্পনা।

'ক' পরিকল্পনাটি ছিল সেই সব স্কুলের জন্য যারা স্বাধীন স্কুল হলেও পরে শিক্ষাদপ্তরের কাছ থেকে সরাসরি অর্থসাহায্য গ্রহণ করতে স্থরু করেছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ধরনের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির মধ্যে থেকে শিক্ষাদপ্তর কতকগুলি স্কুলকে বেছে নেবেন এবং নিজেদের তালিকাভুক্ত করবেন। এই ধরনের তালিকাভুক্ত স্কুলগুলিতে বেতন প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হবে কিংবা অনুমোদিত আয়ের স্কেল অনুযায়ী বেতনের হার কম থেকে ধীরে ধীরে বাড়ান হবে। বোর্ডিং-এ থাকার খরচাও এইভাবে কম থেকে ধীরে ধীরে বাড়ান হবে। এল-ই-এ'র জন্য স্কুলে এবং বোর্ডিংএ কতকগুলি আসন পৃথক করা থাকবে এবং সেগুলিতে যে সব ছাত্রকে ভর্তি করা হবে তাদের

সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে এল-ই-এর উপর। এই সব স্কুলের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক নিযুক্ত করবে এল-ই-এ।

প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৪'র আইন অনুযায়ী যে সব স্কুলকে স্বাধীন বলা হয়েছে তাদের উপর এই পরিকল্পনাটি প্রযোজ্য নয়।

যে সব স্কুল সত্যকার পাব্লিকস্কুল বলে পরিচিত 'খ' পরিকল্পনাটি তাদের উপর প্রযোজ্য। অবশ্য এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সব পাব্লিকস্কুল যেগুলিতে পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে আবাসিক ছাত্র নেবার ব্যবস্থা আছে। এল-ই-র সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত দুবছর পড়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা যাতে পাব্লিকস্কুলে যোগ দিতে পারে তার জন্য এল-ই-এ ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করবেন। এই ছাত্রবৃত্তি থেকে হোষ্টেলের খরচা স্কুলের বেতন ও অন্যান্ত ব্যয়ভার বহন করা যাবে। যে সব পাব্লিকস্কুল এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করবে তারা বছরে মোট যত ছাত্র ভর্তি করবে তার অন্তত এক-চতুর্থাংশ এল-ই-এ'র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র নেবে। এই ব্যবস্থার ফলে পাব্লিকস্কুলের ছাত্রেরা কেবল বিশেষ একটি সামাজিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যে সকল অভিভাবক পাব্লিকস্কুলের ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ তাঁদেরও ছেলেরা এই পরিকল্পনায় পাব্লিকস্কুলে যোগ দেবার সুযোগ পাবে। প্রথম প্রথম এক-চতুর্থাংশ ছাত্রের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হলেও ধীরে ধীরে এল-ই-এ'র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা বাড়ান হবে যাতে আর্থিক প্রশ্ন নিরপেক্ষভাবে সকল স্তরেরই ছেলেই পাব্লিক স্কুলে পড়তে পারে।

বৃত্তির যোগ্য ছেলেমেয়েদের নির্বাচন করার নিয়ম হল যে প্রথমে অভিভাবকেরা স্থানীয় এল-ই-এর মাধ্যমে মন্ত্রীদপ্তরে আবেদন করবেন। তারপর সেই ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রীদপ্তর কতকগুলি আঞ্চলিক সাক্ষাৎকার বোর্ড তৈরী করবেন এবং সেই বোর্ডগুলি তাদের সুপারিশ পাঠাবে একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির কাছে। কোন্ কোন্ আবেদন গ্রাহ্য করা হবে তার চরম নির্দেশ এই কমিটিই মন্ত্রীদপ্তরের সামনে উপস্থাপিত করবে।

এই পরিকল্পনার একটা অসুবিধা হচ্ছে যে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয় ১১ বছর বয়সে। কিন্তু পাব্লিকস্কুলে প্রবেশ করার বয়স হল ১৩ বছর। সেইজন্য প্রস্তাব করা হল যে এল-ই-এর বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা

প্রাথমিক পাঠ শেষ করে পাব্লিকস্কুলের কিশোর বিভাগ থাকলে সেখানে কিংবা কোন প্রিপ্যারেটরি স্কুলে বাকী দুবছর শিক্ষাগ্রহণ করে পাব্লিকস্কুলে যোগ দেবে। তাছাড়া যে সব পাব্লিকস্কুল এই পরিকল্পনাভুক্ত হবে তাদের পরিচালকদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ এল-ই-এ'র মনোনীত হবে।

এই হল সংক্ষেপে ফ্লেমিং কমিটির সুপারিশ। যদিও কমিটির প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট প্রগতিশীল এবং পাব্লিকস্কুলের শিক্ষাকে সাধারণ ছেলেমেয়েদের নাগালের মধ্যে আনার প্রচেষ্টারূপে প্রশংসনীয় তবু কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী আশানুরূপ কাজ হয় নি। মন্ত্রীদপ্তরের রিপোর্টে দেখা যায় যে মন্ত্রীদপ্তরের মাধ্যমে পাব্লিকস্কুলে ভর্তি করা ছাত্রের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মন্ত্রীদপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট প্রচেষ্টা, ছাত্রনির্বাচনের উপযুক্ত পদ্ধতি ইত্যাদির অভাবই হল পরিকল্পনাটির অসাফল্যের কারণ। তবে ফ্লেমিং কমিটির সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলি একেবারে ব্যর্থ হয় নি। মন্ত্রীদপ্তরের মাধ্যমে যেমন পাব্লিকস্কুলে ছাত্রছাত্রী পাঠান হয় তেমনই অনেকক্ষেত্রে এল-ই-এও অভিভাবকদিগকে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরাসরি পাব্লিকস্কুলে ভর্তি করাতে সাহায্য করে থাকে এবং প্রায়ই তাদের আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যয়ও বহন করে থাকে।

ইংলণ্ডের পাব্লিকস্কুলের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে। প্রথম তাদের গণতন্ত্রবিরোধী প্রকৃতি, দ্বিতীয়, তাদের ব্যয়বহুলতা। ইংলণ্ডের সর্বসাধারণের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাব্লিকস্কুলগুলি যেন কতকগুলি দ্বীপের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন সত্তা বজায় রেখেছে এবং তার ফলে এই সব স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের দল সাধারণ সমাজ থেকে বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে থাকে। এককথায় পাব্লিকস্কুল সামাজিক বিভেদের সৃষ্টিকারক এবং ফলে গণতন্ত্রবিরোধী। এই সমালোচনার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার নয়। তবে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে পাব্লিকস্কুল ইংলণ্ডে সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করেনি, কেননা ইংলণ্ডে এই ধরনের সামাজিক বিভেদ পাব্লিকস্কুলের সৃষ্টির বহু আগে থেকেই চলে আসছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে পাব্লিকস্কুল এই সামাজিক বিভেদকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। সেদিক দিয়ে পাব্লিকস্কুলকে অগণতান্ত্রিক বলাটা ভুল নয়।

পাব্লিকস্কুলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটিও মিথ্যা নয়। বর্তমানে তাদের বার্ষিক বেতনের হার ৩৫০ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৫২৫০ টাকা) থেকে ৪৫০ পাউণ্ডের (অর্থাৎ প্রায় ৬৭৫০ টাকা) মধ্যে। বলা বাহুল্য সাধারণ অভিভাবকদের পক্ষে একটি ছেলের জন্য এই বিরাট অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয়। ফলে পাব্লিকস্কুলের শিক্ষা সাধারণ ছেলেমেয়েদের আওতার বাইরে। গণতান্ত্রিক আদর্শসম্পন্ন দেশে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে এই অসাম্য বাঞ্ছনীয় নয়। এই গণতন্ত্র বিরোধী প্রকৃতির জন্য অনেকেই পাব্লিকস্কুল উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু পাব্লিকস্কুলের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতাও অস্বীকার করার নয়। তাদের আবাসিক সমাজ জীবন, ব্যক্তিগত মনোযোগ, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রতিযোগিতামূলক নানা খেলাধূলা, হাউস সিষ্টেম্, প্রিফেক্ট সিষ্টেম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য পাব্লিকস্কুলের শিক্ষণের মান সব দিক দিয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল। তার জন্যই ইংলণ্ডের পাব্লিকস্কুল তীব্র সমালোচনার মধ্যে দিয়েও কেবল যে টিঁকে আছে তা নয়, দিন দিন শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

এই সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হল পাব্লিক স্কুল এবং জনসাধারণের স্কুল অর্থাৎ গ্রামার স্কুলের মধ্যে পার্থক্যটা কমিয়ে আনা। সাধারণ গ্রামার স্কুলের শিক্ষণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে যাতে পাব্লিকস্কুলের পর্যায়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। দ্বিতীয়ত পাব্লিকস্কুলে যাতে জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে ফ্লেমিং কমিটির পরিকল্পনাটিকে অবিলম্বে বাস্তবে রূপ দেওয়া কর্তব্য। এর ফলে পাব্লিকস্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন অসামাজিক স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকবে না এবং সামাজিক বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কাও কমে যাবে।

**বালিকা বিদ্যালয়ঃ**

ইংলণ্ডে ছেলেদের স্কুল বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও মেয়েদের জন্য স্কুলের সৃষ্টি কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক। একশ বছর আগেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মেয়েদের স্কুল ছিল না। যে কয়েকটি ছিল তার অধিকাংশই হয় কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়, কিংবা কোন দাতব্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হত। তাছাড়া ধর্মযাজক, সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনীর কর্মচারী কিংবা এই ধরনের কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিছু কিছু বিশেষধর্মী

স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত স্কুল, যেগুলি নিছক ব্যবসায় হিসাবে চালান হত। এই স্কুলগুলির কোন সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি বা স্বরূপ ছিল না। সাধারণ ঘরের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কোন উপযোগী স্কুল ছিল না। যাঁদের সামর্থ্য ছিল তাঁরা তাঁদের মেয়েদের হয় ঘরে গভর্নেস রেখে পড়াতেন নয় কোন প্রাইভেট স্কুলে দিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন টমাস আনর্ল্ডের অনুপ্রেরণায় ছেলেদের পাব্লিক স্কুলগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেই সময় মেয়েদের জন্যও অনুরূপ পাব্লিকস্কুল খোলার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য মেয়েদের পাব্লিকস্কুল হল নর্থ লণ্ডন কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৫০ সালে মিস বাস্ (Miss Buss) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চেলটেন্‌হাম লেডিস কলেজ ১৮৫৩ সালে মিস বিল (Miss Beale) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না, কিন্তু পরে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই মেয়েদের কলেজ খোলা হয়। এর ফলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার স্কুল দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে।

১৮৬৯ সালের এনডাউড্ স্কুল এ্যাক্ট মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই আইনে বলা হয় যে শিক্ষার জন্য দান করা অর্থ কেবলমাত্র ছেলেদের শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হবে না। দানপত্রে মেয়েদের কথা উল্লেখ করা না থাকলেও তা মেয়েদের জন্যও ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে নতুন শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনায় প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের স্কুল খোলার ব্যবস্থা হতে লাগল। ১৮৭২ সালে মেয়েদের পাব্লিক ডে স্কুল কোম্পানী স্থাপিত হয়। এই কোম্পানী ১৮৭৩ সালে প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে। ১৯০৩ সালের কোম্পানীর স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪। প্রথম মেয়েদের আবাসিক পাব্লিক স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৭৭ সালে সেণ্ট এণ্ড্রুজে। তারপর বহু অনুরূপ আবাসিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে যেমন রোডিন (Roedean) ১৮৮৫ সালে, উইকমব এ্যাবি (Wycombe Abbey) ১৮৯৬ সালে, সের-বোর্ন (Sherborne) ১৮৯৯ সালে ইত্যাদি। এগুলিতে বলতে গেলে ছেলেদের পাব্লিকস্কুলের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই অনুকরণ করা হয়েছিল। ছেলেদের স্কুলের মত এগুলিতেও হাউস প্রথা, প্রিফেক্ট প্রথা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ইত্যাদি প্রবর্তিত করা হয়েছিল। পাঠক্রমও সাধারণভাবে ছেলেদের স্কুলের অনুরূপ

ছিল যদিও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার প্রতি অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দেওয়া হত।

**প্রিপ্যারেটরি স্কুল ঃ**

পাব্লিক স্কুলের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রিপ্যারেটরি স্কুল নামে এক বিশেষ ধরনের স্কুল ইংলণ্ডে আছে। পাব্লিক স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্য সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা (Common Entrance Examination) নামে একটা পরীক্ষায় পাশ করতে হয় এবং প্রিপ্যারেটরি স্কুলে এই পরীক্ষার জন্যই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সাধারণত আট বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েরা এই সব স্কুলে ঢোকে এবং তের বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করে।

প্রিপ্যারেটরি স্কুলগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল পাব্লিক স্কুলের জন্য ছেলে-মেয়েদের তৈরী করা। তার ফলে পাব্লিক স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রিপ্যারেটরি স্কুলের পাঠক্রম নির্ধারিত করা হয়েছে। এদের পাঠক্রমে পাওয়া যাবে প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক ভাষা, গণিত এবং বিজ্ঞান—এমন সব বিষয় যা রাষ্ট্রচালিত প্রাথমিক স্কুলে পড়ান হয় না। তাছাড়া প্রিপ্যারেটরি স্কুলের উন্নতি নির্ভর করছে ছাত্রছাত্রীদের পাব্লিক স্কুলের জন্য প্রস্তুতকরণের উপর এবং তার ফলে অনেক প্রিপ্যারেটরি স্কুলের শিক্ষণের মান যথেষ্ট উন্নত।

প্রিপ্যারেটরি স্কুলগুলির নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নাম ইনকরপোরেটেড্ এ্যাসোসিয়েসন অফ প্রিপ্যারেটরি স্কুলস্। প্রিপ্যারেটরি স্কুলগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার আবাসিক প্রকৃতির। মেয়েদের জন্যও প্রিপ্যারেটরি স্কুল আছে, তবে ছেলেদের স্কুলের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম।

## ১১। অধিকতর শিক্ষা (ক)

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে মাত্র তিন স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর। অধিকতর শিক্ষা বলতে বোঝায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স পার হয়ে গেছে এমন ব্যক্তির পূর্ণকালীন বা অংশকালীন যে কোন শিক্ষা। তা ছাড়া কৃষ্টিমূলক শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে অবসর যাপনের ব্যবস্থাও অধিকতর শিক্ষার অন্তর্গত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে অধিকতর শিক্ষার কর্মপরিধি অতিমাত্রায় ব্যাপক। কেননা পূর্ণকালীন বা অংশকালীন অধিকতর শিক্ষা দান করে এমন মাধ্যম বহুপ্রকারের হতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীভুক্ত মাধ্যম ইংলণ্ডে এত বিভিন্নধর্মী ও এত প্রচুর আছে যে তাদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। সংগঠন, আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়।

বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাও অধিকতর শিক্ষার পর্যায়েই পড়ে। তবে সেগুলিকে আমরা পরবর্তী একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

অধিকতর শিক্ষার মাধ্যমগুলিকে আমরা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন, বৃত্তিমূলক, অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে তার বৃত্তিতে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করা। যেমন, বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষার যে সব আয়োজন আছে। তেমনই আবার কতকগুলি প্রতিষ্ঠান হল সংস্কৃতিমূলক, অর্থাৎ যে সব প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা ইত্যাদির চর্চা হয়।

আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান- নিছক শিক্ষামূলক। যেমন ছোট ছোট সহর ও গ্রামে স্কুলপাঠ্য বিষয়ের সান্ধ্য ক্লাশ হয় এবং অনেকেই তাদের শিক্ষার অসম্পুর্ণতা দূর করার জন্য সেই সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়।

তাছাড়া বহু নিছক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেও অধিকতর শিক্ষার মাধ্যম বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন উইমেনস্ ইনষ্টিটিউটস্, ওয়াই-এম-সি-এ, ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ও

সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে অনেক মূল্যবান্ শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা নরনারী লাভ করে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ইংলণ্ডের অধিকতর শিক্ষার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য এককথায় বর্ণনা করা যায় না। বর্তমানে রাষ্ট্র অধিকতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করছেন তা যেমনই ব্যাপক তেমনই বহুমুখী। ব্যক্তিজীবনের শিক্ষামূলক, কৃষ্টিমূলক, বৃত্তিমূলক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলির পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করাই অধিকতর শিক্ষার উদ্দেশ্য।

একই কারণে অধিকতর শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সব বিভিন্ন সংস্থা জন্মলাভ করেছিল সেগুলি আজ অধিকতর শিক্ষার মাধ্যম রূপে পরিচিত। গত ১৫০ বৎসরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এই রকম বহু প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে কত লুপ্ত হয়ে গেছে, আবার কত প্রতিষ্ঠান শিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম রূপে আজও বেঁচে আছে। অধিকতর শিক্ষার এইরকম কতকগুলি প্রখ্যাত মাধ্যমের আমরা আলোচনা করব।

**বয়স্কদের স্কুল** ( Adult School ) :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য আন্দোলন সুরু হয়। ১৮১২ সালে উইলিয়াম স্মিথ নামে এক ব্যক্তি ব্রিষ্টলে বয়স্ক ব্যক্তিদের বাইবেল পড়তে শেখানোর উদ্দেশ্যে একটি স্কুল খোলেন। প্রথমে তিনি সহরের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বাইবেল বিক্রী করতে গেছলেন। যখন দেখলেন যে তারা পড়তেই জানে না তখন তিনি তাদের পড়তে শেখানোর জন্য একটা স্কুল খুললেন। খুব শীঘ্রই এই রকম স্কুল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে এবং চার বছরের মধ্যেই ব্রিষ্টলেই পুরুষদের জন্য ২৪টি এবং মেয়েদের জন্য ৩১টি স্কুল খোলা হল। তাছাড়া প্লিমাউথ, স্যালিস্‌বারি, বাথ্, এবং ওয়েলসেও বয়স্কদের জন্য স্কুল খোলা হল। ১৮২০ সালে লণ্ডন, শেফিল্ড, লীডস্, ম্যানচেষ্টার, লিভারপুল, নিউক্যাসল, ইয়ারমাউথ, ইপস্যুইচ, বার্কসায়ার এবং বাকিংহামসায়ার প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের স্কুল গড়ে উঠতে

লাগল। কিন্তু শীঘ্রই এই উদ্দীপনা কমে এলো এবং ১৮৫০ সালে দেখা গেল সর্বত্রই এই স্কুলের সংখ্যা বেশ কমে এসেছে।

বয়স্কদের স্কুলের দ্রুত অগ্রগতির মূলে ছিল যাজকসম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা। খৃষ্টধর্মের আদর্শ গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন বাইবেল পড়ার আর তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। এই উদ্দেশ্য থেকেই বয়স্ক স্কুলের আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবার কারণ হল অনেকগুলি। প্রথম, সুশিক্ষকের অভাব, দ্বিতীয় দরিদ্রদের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ধনীসম্প্রদায়ের বিরূপ মনোভাব, তৃতীয়, প্রাথমিক স্কুলের প্রসারের ফলে নিরক্ষরতার হ্রাস এবং চতুর্থ, মেকানিকস ইনষ্টিটিউট্ নামে এমন আর একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি। সেখানে বয়স্কদের আরও উন্নত ও কার্যকরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এইসব কারণেই সাধারণ বয়স্ক স্কুলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল।

**মেকানিক্স্ ইন্‌ষ্টিটিউটস্** ( Mechanics' Institutes ) :

সাধারণ বয়স্ক স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল নিছক নিরক্ষরতা দূর করা, তার বেশী নয়। কিন্তু মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরী বৃত্তিতে যে-সব বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হয় সেই সব বিজ্ঞান পড়ান হত মেকানিক্স্ ইনষ্টিটিউটে। একদিক দিয়ে সাধারণ বয়স্ক স্কুলের চেয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার বেশী হওয়ার একটা কারণ হল যে ধনী ও কারখানার মালিকেরা দরিদ্র শ্রমিকদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন কিন্তু কারিগরী শিক্ষা দেওয়াতে তাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনই ছিল। কেননা, সাধারণ শিক্ষা পেলে দরিদ্র জনসমাজ ধনী সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কিন্তু কারিগরী শিক্ষা পেলে এ সম্ভাবনা নেই বরং তারা কারখানায় কাজ আরও ভালো ভাবে করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ডক্টর বার্কবেক ( Dr. Birkbeck ) কয়েকজন কৌতূহলী মেকানিকদের ( যাঁরা তাঁর জন্য একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত করছিল ) কাছে বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দেন। তাঁর চতুর্থ বক্তৃতার সময় দেখা গেল যে তাঁর শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০তে। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ ১৮২৩ সালে সৃষ্ট হয় লণ্ডন মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউট।

দেখতে দেখতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে এবং ১৮৫০ সালে সমগ্র দেশে ৬১০টি মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউট গঠিত হয়। কিন্তু এর পর থেকেই ক্রমশ এই আন্দোলনটিও স্তিমিত হয়ে আসে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি একের পর এক উঠে যেতে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লণ্ডন মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউটই পরে লণ্ডন ইউনিভারসিটির অন্তর্ভুক্ত প্রসিদ্ধ বার্কবেক কলেজে পরিণত হয়। মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউটগুলির ব্যর্থতার একটি কারণ হল যে সেখানে কেবলমাত্র কারিগরী শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হত, সাধারণ শিক্ষাকে অবহেলা করা হত।

## ইউনিভার্সিটি এক্সটেন্সান (University Extension) ঃ

যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইরের শ্রোতাদের জন্য বক্তৃতা বা আলোচনার আয়োজন করা হয় তখন তাকে ইউনিভারসিটি এক্সটেনসান বা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ বলা হয়। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সব প্রগতিশীল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইরের শ্রোতাদের জন্য বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডেও ইউনিভারসিটি এক্সটেনসান অধিকতর শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই আন্দোলনের স্রষ্টিকর্তা হলেন জেমস্ স্টুয়ার্ট নামে একজন স্কটল্যাণ্ড-বাসী। তিনি প্রথম কয়েকটি বয়স্কদলের কাছে বক্তৃতা দেবার পর তাদের পরামর্শ দেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করতে বক্তৃতার আয়োজন করার জন্য। তাদের আবেদনে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায় এবং সেই থেকে অক্সফোর্ড, লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও এই রকম বক্তৃতার আয়োজন করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণের ফলে বয়স্ক-শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বহুল পরিমাণে বেড়ে উঠেছে এবং ফারক্রফ্‌ট (১৯০৯) হিলক্রফ্‌ট, (১৯২০) এ্যাভনক্রফ্‌ট (১৯২৫) প্রভৃতি একাধিক আবাসিক কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তবে শ্রমিক-শিক্ষা-সংস্থা (Workers' Educational Association) নামক প্রতিষ্ঠানটির সহযোগে বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণের কার্যাবলীই বোধ করি বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান।

**শ্রমিক-শিক্ষা-সংস্থা** (Workers' Educational Association) :

শ্রমিক-শিক্ষা-সংস্থা বা ডব্লিউ-ই-এ'র (W. E. A) প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যালবার্ট ম্যানস্‌ব্রিজ্‌ (Albert Mansbridge)। বিভিন্ন সমবায় সমিতি বিভিন্ন ট্রেড্‌ ইউনিয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ এই তিনশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে একটি সম্মিলিত শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যেই ম্যানস্‌ব্রিজ এই শ্রমিক শিক্ষাসংস্থাটি গঠন করেন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রথম তাঁর পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করেন এবং ঐ সালেই "শ্রমিকদের উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠান" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৯০৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় শ্রমিক শিক্ষা সংস্থা (Workers' Educational Association)। শ্রমিক-শিক্ষা-সংস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি বৈশিষ্ট্য হল এর টিউটোরিয়াল পদ্ধতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ বক্তৃতাবলী। এর ফলে বয়স্কশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হতে লাগল। ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জয়েন্ট টিউটোরিয়াল কমিটি (Joint Tutorial Commitee) গঠিত হল। এই কমিটিগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক-শিক্ষা-সংস্থা এবং এল-ই-এ'র প্রতিনিধিরা সদস্যরূপে ছিলেন। এই কমিটির প্রচেষ্টায় বয়স্কদের জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষাবোর্ডও এই আন্দোলনকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে সুরু করলেন। ১৯১৪ সালে দেখা গেল ১৩০টি তিন বৎসর ব্যাপী টিউটোরিয়াল ক্লাশ স্থাপিত হয়েছে। এই ক্লাশগুলিতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে তিন বৎসর যোগ দিতে হয়। ১৯২৩ সালে এই টিউটোরিয়াল ক্লাশের সংখ্যা দাঁড়াল ২৮২। এর পরে এক বৎসরের টিউটোরিয়াল ক্লাশও খোলা হয়। এই ক্লাশের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৩৮ সালে ৫৬,০০০ বয়স্ক শিক্ষার্থী এই ধরনের ক্লাশে যোগ দিত। ১৯৫০ সালে টিউটোরিয়াল ক্লাশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৯০তে, এবং ছাত্রসংখ্যা ১৬২,৮৫০ তে।

এই টিউটোরিয়াল ক্লাশের জনপ্রিয়তা দেখে অনেক জায়গায় এল-ই-এ থেকে বয়স্কদের জন্য আবাসিক কলেজ খোলা হয়েছে। এই সব কলেজে ১ মাসের চেয়ে স্বল্পকাল স্থায়ী পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। ১৯৫৩ সালে এই রকম কলেজের সংখ্যা ছিল ২৬টি এবং সেখানে মোট ২৮,২০০ শিক্ষার্থী

স্বল্পকালীন শিক্ষা লাভ করত। বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রমে প্রধানত থাকে ইতিহাস, কলা, সমাজ-বিজ্ঞান, ইংরাজীসাহিত্য এবং মনোবিজ্ঞান।

**উইমেনস্ ইনষ্টিটিউটস্** (Women's Institutes) :

মেয়েদের অধিকতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের জন্ম অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। ন্যাশানাল ফেডারেসান অফ্ উইমেনস্ ইনষ্টিটিউটস্ (National Federation of Women's Institutes) প্রথম গঠিত হয় প্রথম যুদ্ধের পর। তারপর দেখতে দেখতে গ্রামে গ্রামে এই ধরনের ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠেছে এবং তাদের সদস্যসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষের মত। এই মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য বহুবিধ, যেমন শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া, সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত করা, গার্হস্থ্যজীবন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দেওয়া ইত্যাদি।

**যুব প্রতিষ্ঠান** (Youth Organisations) :

ইংলণ্ডে অধিকতর শিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যমরূপে বর্তমানে কাজ করছে একাধিক যুব প্রতিষ্ঠান। যেমন, ওয়াই-এম-সি-এ (১৮৪৪), ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ (১৮৫৩) বয়স্কাউট (১৯০৮), গার্লস্গাইড্ (১৯১০) ইত্যাদি। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিপূর্বে রাষ্ট্রের কোন সাহায্য পেত না। কিন্তু যুদ্ধের পর কিশোর-অপরাধের পরিমাণ যখন ভয়াবহরূপে বেড়ে উঠল তখন সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোযোগ দিলেন। শিক্ষাবোর্ডের অধীনে একটি জুভেনাইল অর্গানিজেসান্স্ কমিটি (Juvenile Organisations Committee) তৈরী হল এবং কমিটি বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি নিয়ে প্রতি অঞ্চলে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করলেন। শীঘ্রই এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলি সংখ্যায় দ্রুত বাড়তে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে নানা কারণে এই সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তখন সরকার যুব সংগঠনগুলির সংরক্ষণের জন্য জাতীয় যুব সমিতি (National Youth Committee) তৈরী করেন। সেই থেকে যুব প্রচেষ্টা ও যুব সংগঠন এল-ই-এ'র কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুব সংগঠনের মধ্যে পড়ে নানারূপ কাজ কর্ম যেমন অভিনয়, বিতর্ক, নানাবিধ খেলাধূলা, ক্যাম্প-ফেলা, ইত্যাদি। ১৯৫৮ সালের ২৪০টি পূর্ণকালীন এবং ৩৩টি অংশকালীন যুবসংগঠন ছিল।

S.N. Test ✓

## ১২। অধিকতর শিক্ষা (খ)

**কারিগরী ও শিল্পমূলক শিক্ষা ( Technical Education ) ঃ**

যে সব ব্যক্তিরা শিক্ষার পালা শেষ করে নানা রকম শিল্পমূলক বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে তাদের শিল্পমূলক শিক্ষা দেবার জন্য বহু বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যম ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডে শিল্পমূলক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না এবং তার ফলে ইংলণ্ডের শিল্পের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ নিম্নস্তরের ছিল। ১৮৫১ সালের গ্রেট এগজিবিসান ( Great Exhibition) এবং ১৮৬৭ সালে ফ্রেঞ্চ এগজিবিসান (French Exhibition) থেকে ইংলণ্ডের জননেতারা জানতে পারলেন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় তাঁদের দেশ শিল্পের দিক দিয়ে কত পেছিয়ে আছে। ফলে পর পর দুটি রাজকীয় কমিশন স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৯ সালে টেকনিক্যাল ইন্‌স্ট্রাকসান এ্যাক্ট পাশ হয়। সেই থেকে শিল্পমূলক এবং কারিগরী শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বর্তাল স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর। এর ফলে শিল্পমূলক শিক্ষার নানা মাধ্যম নানা দিক দিয়ে গড়ে উঠতে লাগল। অনেক মেকানিক্‌স্ ইনষ্টিটিউট্‌ও কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। যেমন লণ্ডন মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউট্ গড়ে উঠল পরে বার্কবেক কলেজ রূপে। লীড্‌স, হার্ডসফিল্ড্, ব্র্যাডফোর্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান অঞ্চলেও মেকানিক্‌স্ ইনষ্টিটিউটগুলি কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমরূপে গড়ে উঠল। ১৮৮০ সালে সিটি এবং গিল্ড্‌স ইনষ্টিটিউট্ স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী-কালে এই ইনষ্টিটিউট থেকে জন্ম নেয় ফিন্‌সবারি টেক্‌নিক্যাল কলেজ। এদিকে একই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুলবোর্ডগুলি থেকে কন্টিনিউয়েসান স্কুল স্থাপিত করা হয়। সেগুলিও দিন দিন সংখ্যায় বেড়ে চলে। ১৮৯৯ সালে দেখা যায় যে প্রায় ৫ লক্ষের কাছাকাছি শিক্ষার্থী কন্টিনিউয়েসান স্কুলে শিক্ষা লাভ করে। ১৯০২ র আইনের ফলে বোর্ডের কন্টিনিউয়েসান স্কুলগুলি এবং এল-ই-এ'র সান্ধ্য টেকনিক্যাল স্কুলগুলি মিলিত হয়ে এক ধরনের অধিকতর শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত হয়।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে কারিগরী শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব

বিস্তার করত দুটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, প্রথম, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ ( Science and Art Department ) এবং দ্বিতীয়, সিটি ও গিল্ড্‌স্ অফ্ লণ্ডন ইনষ্টিটিউট্ ( City and Guilds of London Institute )। এ দুটি প্রতিষ্ঠানেই অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারাই কারিগরী শিক্ষার মান নির্ধারিত হত। এই সব পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের "একটি বিষয়ের" কোস নেবার ব্যবস্থা ছিল। এই এক-বিষয়ের কোর্সগুলি এমনভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা থাকত যার ফলে পরীক্ষার্থীদের একটি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অংশকালীনভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে হত। এর পরে বহু আঞ্চলিক পরীক্ষাগ্রহণকারী সংস্থা গড়ে উঠল, যেমন, ল্যাঙ্কাসায়ার এবং চেসায়ার ইনষ্টিটিউটগুলির ইউনিয়ন, এডুকেশানাল ইনষ্টিটিউসানের ইউনিয়ন ইত্যাদি। আঞ্চলিক ইউনিয়নগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের পরীক্ষাগ্রহণের দায়িত্বটা নিজেদের হাতে উঠিয়ে নিল। আঞ্চলিক ইউনিয়নের হাতে পরীক্ষাগ্রহণের ভার পড়াতে শিল্পমূলক শিক্ষার প্রকৃতিও বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্ধারিত করা সম্ভব হল।

কিন্তু এক দিক দিয়ে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির পরীক্ষায় একটা গলদ রয়ে গেল। এই সংস্থাগুলির প্রদত্ত সার্টিফিকেট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সার্টিফিকেটের মত সর্বজনীন বলে পরিগণিত না হয়ে আঞ্চলিক বলে পরিগণিত হল। এই ত্রুটি দূর করার জন্য শিক্ষাবোর্ড 'জাতীয়' সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা দেবার প্রথার প্রবর্তন করলেন। এই সার্টিফিকেট পেতে হলে কেবল পরীক্ষা দিলে চলবে না শিক্ষার্থীদের অন্তত ৫ বছরের জন্য অংশকালীন পাঠ গ্রহণ করতে হবে এবং কারখানা ও গবেষণাগারের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে হবে।

১৯২১ সালে প্রথম জাতীয় সার্টিফিকেট দেওয়া হয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ এবং তারপর থেকে অন্যান্য বিষয়েও সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এই শ্রেণীর কারিগরী শিক্ষা যে কত জনপ্রিয় হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে একটা ঘটনায়। ১৯৫০ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ জাতীয় সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ৮,০৪৯টি, তার মধ্যে ৫৬১৪টি উচ্চস্তরের এবং ২৪৩৫টি নিম্নস্তরের। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর যে সব

ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার যোগ্য বলে মনে করা হত না তাদের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অনেক টেকনিক্যাল স্কুল ছিল। সেগুলিতে দিনে টেকনিক্যাল ক্লাশ খোলা হয়েছিল। এই স্কুলগুলির মধ্যে অনেকগুলি দু বছরের ক্লাশ-সম্পন্ন জুনিয়ার টেকনিক্যাল বা বাণিজ্যিক বা কলামূলক স্কুলে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে এই সকল প্রকার স্কুলগুলিই মাধ্যমিক টেকনিক্যাল স্কুলে পরিণত হয়। তখন ৩০৭টি এই ধরনের স্কুল ছিল।

এছাড়া অনেক কারখানা ও ফ্যাক্টরির মালিকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের শ্রমিকদের কিছুক্ষণের জন্য দিনের বেলা ছুটি দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এর ফলে শ্রমিকরা ডে-কন্টিনিউয়েশান কলেজে কিছু সময়ের জন্য যোগ দিতে পারে। এই ভাবে দিনের বেলা অংশকালীন ছুটি দেওয়া হয় এমন শ্রমিকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, যথা, ১৯৩৯ সালে ৪২,০০০, ১৯৪৯ সালে ২৪১,৪৮৭, ১৯৫৩ সালে ৩ লক্ষেরও উপরে। কিন্তু এর ফলে সান্ধ্য কন্টিনিউয়েশান ক্লাশে যোগদানকারী ছাত্রের সংখ্যা মোটেই কমেনি, তাও বাড়ার পথে। ১৯৫০ সালে ১৮ লক্ষের উপর শিক্ষার্থী সান্ধ্য কন্টিনিউ-য়েশান ক্লাশে যোগদান করেছে।

**জাতীয় কলেজ** ( National College ) ঃ

বয়স্কদের কারিগরী শিক্ষার জন্য সাম্প্রতিককালে জাতীয় কলেজ ( National College ) নামে এক নতুন শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এমন অনেক বিশেষ প্রকৃতির শিল্প আছে যেগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা তুলনায় বেশ কম। তার ফলে তাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে ট্রেনিং সেণ্টার খোলা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই সকল শিল্পের জন্য এক একটি জাতীয় কলেজ খোলা হয়ে থাকে। এই ধরনের প্রথম জাতীয় কলেজের নাম ন্যাশনাল কলেজ অফ্ হর‍্যালজি ( National College of Horology ), ঘড়ি-নির্মাণ-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর অনেকগুলি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়েছে যেমন রাবার শিল্পের জন্য কলেজ-অফ্-রাবার টেকনোলজি, বাকিংহামসায়ারের ক্র্যান্‌ফিল্ডে কলেজ অফ্ এ্যারোনটিক্‌স্ ( ১৯৪৬ ), ওলভারহ্যাম্পটনে লোহা ঢালাই শিল্পের জন্য ন্যাশনাল ফাউণ্ডি কলেজ ( ১৯৪৮ ), কলেজ অফ্ হিটিং, ভেন্‌টিলেটিং,

রেফ্রিজারেসান এবং ফ্যান ইন্‌জিনীয়ারিং ( ১৯৪৮ ), স্মিথফিল্ডে ন্যাশন্যাল লেদার সেলার্স কলেজ ( ১৯৫১ ), ন্যাশনাল কলেজ অফ্ ফুড টেকনোলজি ( ১৯৫২ ) ইত্যাদি। শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই কলেজগুলিকে ঐ বিশেষ শিল্পের উপর উন্নত শিক্ষাপ্রদান এবং উপযোগী গবেষণাকার্যের জাতীয় কেন্দ্র বলে মনে করতে হবে।

**রয়াল কলেজ অফ্ আর্ট** ( Royal College of Art ) :

ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অফ্ আর্ট নামে কলাবিদ্যালয় কলেজটি বর্তমানে বহু পুরাতন ও জাতীয় কলেজের শ্রেণীভুক্ত। বর্তমানে এর দশটি বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং প্রত্যেকটী বিভাগে কোন একটি বিশেষ ফলিত কলার উন্নত শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে।

**পার্সি কমিটির** ( Percy Committe ) **বিবরণী—১৯৪৫ :**

ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও ক্রমবিকাশের স্বরূপ জানতে হলে পার্সি কমিটির নির্দেশগুলি জানা দরকার। ১৯৪৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মিঃ বাটলার লর্ড ইউস্টেস পার্সির সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ড ও ওয়েলসে উন্নত কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং যাতে সেইমত ব্যবস্থা হয় তার নির্দেশ দান করা। এই কমিটির একটি প্রয়োজনীয় দ্রষ্টব্য হল কেমন করে বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা বজায় রাখা যায়।

পার্সিকমিটি অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, প্রথমত উচ্চতম গুণসম্পন্ন শিল্পকর্মীদের অভাবে ইংলণ্ডের জাতীয় শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এর কারণ হল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যথেষ্ট সংখ্যায় শিল্পকর্মী প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নেই। তৃতীয়ত, শিল্পকর্মীদের কেবলমাত্র শিল্পসম্বন্ধে দক্ষ হলেই হবে না, তাদের ভাল পরিচালক ও সংগঠক হতে হবে।

কমিটির মতে উচ্চতম শিল্পমূলক শিক্ষা দেওয়াও বৈজ্ঞানিক, গবেষক এবং শিক্ষক তৈরী করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেরই অন্তর্গত থাকবে এবং বিভিন্ন

শিল্পের সহকারী কর্মী, দক্ষ কারিগর ইত্যাদি তৈরী করা হবে শিল্পকলেজগুলির কাজ। তবে কোন কোন শিল্পমূলক কলেজে বিশেষ বিশেষ শিল্প-ঘটিত সমস্যা নিয়ে গবেষণা করারও ব্যবস্থা থাকবে।

**আঞ্চলিক কাউন্সিল ও বোর্ড** (Regional Council & Boards) ঃ

কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বিভিন্ন কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় আনা। এর জন্য কমিটি আঞ্চলিক কাউন্সিল এবং বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছেন। প্রত্যেক আঞ্চলিক কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিল্প-সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির প্রতিনিধি থাকবে। এই কাউন্সিলগুলির কাজ হবে কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম-গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনকরা। প্রত্যেক কাউন্সিল আবার তৈরী করবেন একটি করে আঞ্চলিক এ্যাকাডেমিক বোর্ড ( Regional Academic Board )। তাতে থাকবেন স্থানীয় কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। এই বোর্ডের কাজ হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের উচ্চতর শিল্পমূলক শিক্ষার সুসমন্বয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া। টেকনিক্যাল কলেজগুলি থেকে যে সব শিক্ষার্থীরা সাফল্যের সঙ্গে পাশ করবে তাদের ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয় দেবে, কি কলেজ দেবে, এ নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এক দলের মতে কলেজ থেকেই ডিগ্রী দেওয়া উচিত, আবার আর একদলের মতে ডিগ্রী দেবার অধিকার সবদেশেই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্ষামন্ত্রী কমিটির নির্দেশগুলি গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সালের মধ্যেই সর্বত্র আঞ্চলিক কাউন্সিল ও এ্যাকাডেমিক বোর্ড স্থাপন করা হয়। কাউন্সিলের কাজ হল প্রধানত অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বোর্ডের কাজ হল উন্নত শিল্পমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া। কাউন্সিল ও বোর্ড উভয়েরই প্রধানতম উদ্দেশ্য হল একদিকে যেমন স্থানীয় কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা বজায় রাখা, তেমনই অপর পক্ষে জাতীয় শিল্পের অগ্রগতির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্থায়ী সংযোগ স্থাপন করা।

**সরকারী শ্বেতপত্র ( White Paper )—১৯৫১ :**

ন্যাশন্যাল এ্যাডভাইসরী কাউন্সিলের (National Advisory Council) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৫১ সালে ইংলণ্ডের সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রের দুটি প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, কতকগুলি বিশেষভাবে নির্বাচিত টেক্‌নিক্যাল কলেজকে বর্ধিত অর্থসাহায্য দেওয়া এবং দ্বিতীয়, শিল্পবিদ্যাবিদদের (Technologist) জন্য একটি রয়্যাল চার্টার অফ্ এ কলেজ ফর টেকনোলজিষ্ট স্থাপন করা। এই কলেজটির কাজ হবে এ্যাসোসিয়েট্‌সিপ, মেম্বারসিপ এবং ফেলোসিপ দান করা এবং এই সব সম্মান পেতে হলে উচ্চতর শিল্পবিদ্যার যে পাঠক্রম অনুসরণ করতে হবে তা নির্ধারিত করা।

১৯৫২ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মিস্ ফ্লোরেন্স হসব্রাগ জানান যে রয়াল কলেজ অফ্ টেকনোলজিষ্টের প্রস্তাবটি বর্জন করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে সরকার অদূর ভবিষ্যতে একটি শিল্পবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় ( University of Technology ) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৪ সালে অবশ্য সরকার পক্ষ থেকে জানান হয় যে তাঁরা লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্সে এবং তার বাইরে গ্লাসগো, ম্যানচেষ্টার, লীডস্ এবং বার্মিংহামের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিল্পবিদ্যালয়মূলক শিক্ষার একটি কেন্দ্রীভূত বিকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

যদিও এই শ্রেণীর উন্নত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে দেরী আছে, তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে ইংলণ্ডের সরকার কারিগরী শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছেন এবং সরকারী অর্থসাহায্যও দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমানে শিক্ষাদপ্তর বিভিন্ন এল-ই-এ'র কাছ থেকে তাঁদের পরিকল্পিত শিক্ষামূলক শিক্ষার পাঠক্রম বা কোর্সের খসড়া আহ্বান করেন এবং সেগুলির মধ্যে যেগুলি তাঁদের মতে সবদিক দিয়ে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সেগুলিকে তাঁরা অনুমোদিত কোর্স বলে ঘোষণা করেন এবং সেগুলির জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করেন। শিক্ষাদপ্তরের মতে উপযুক্ত স্থান সাজসরঞ্জাম, শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া কোন উন্নত কারিগরী শিক্ষা কার্যকরী হতে পারে না। এই অনুমোদিত কোর্সের প্রথা প্রবর্তনের ফলে ১৯৫৩ সালের শেষে দেখা যায় যে বিভিন্ন এল-ই-এ থেকে

প্রায় এক হাজারের মত কারিগরী শিক্ষার খসড়া শিক্ষাদপ্তরের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। তার মধ্যে ৩৮২টি কোর্স শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই সংখ্যাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ইংলণ্ডে উন্নত কারিগরী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া গত কয়েক বৎসরে শিল্পমূলক গবেষণারও যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। বড় বড় শিল্প-বিদ্যার কলেজগুলিতে শিল্পমূলক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে।

ইংলণ্ডে কারিগরী শিক্ষার এই বিপুল প্রসারের অধিকাংশই ঘটেছে গত মহাযুদ্ধের পরে এবং এই দ্রুত প্রসারের একটা প্রধান কারণই হল মহাযুদ্ধ। কিন্তু শিল্পশিক্ষার নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে প্রসারিত করা এ দুয়েরই জন্য প্রয়োজন নতুন বাড়ী এবং উপযোগী বাড়ীর ব্যবস্থা করাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় প্রায় ২০টি প্রতিষ্ঠানের বাড়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সময় যদি সরকার উদার অর্থ সাহায্যের নীতি নিয়ে এগিয়ে না আসতেন তাহলে শিল্পশিক্ষার বর্তমান উন্নতি ঘটত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র অনুমোদিত পরিকল্পনার মোট ব্যয় ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী, ১৯৪৮ সালে ঐ ব্যয় দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ পাউণ্ডের উপরে। ১৯৫৩ সালের হিসাবে দেখা যায় যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার বছর থেকে সুরু করে ঐ বছর পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

# ১৩। শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষণ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মনিটোরিয়াল ( monitorial ) প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথায় শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে থেকেই বিশেষ কয়েকজনকে বেছে নিতেন এবং তাদের শিক্ষকতার কাজে শিক্ষা দিতেন। পরে এই মনিটাররাই শিক্ষকরূপে গড়ে উঠত। এই মনিটার প্রথাকেই ইংলণ্ডের প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

মনিটারেরা স্কুলের পাঠ শেষ করার আগেই শিক্ষাবৃত্তিতে শিক্ষালাভ করত। এ প্রথা ত্রুটীপূর্ণ বলে ১৮৩৯ সালে শিক্ষার কমিটি-অফ-কাউন্সিলের সম্পাদক কে-সাট্‌ল্‌ওয়ার্থ ছুটি পরিবর্তন আনেন। প্রথম মনিটারদের পরিবর্তে তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। ছাত্র শিক্ষক বলতে সেই সব শিক্ষার্থীদের বোঝায় যারা স্কুলের পাঠ শেষ করে বেরিয়েছে।

কে-সাট্‌লওয়ার্থের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা এবং তারই প্রচেষ্টায় ১৮৪০ সালে ব্যাটারসিতে ( Battersea ) ইংলণ্ডের প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপিত হয়। এর পর থেকে এই শ্রেণীর কলেজ দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বাড়তে থাকে এবং ১৯০০ সালের মধ্যে ৬১টি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপিত হয়। এর মধ্যে ৪৫টি আবাসিক শ্রেণীর এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মমূলক সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত। অ-সাম্প্রদায়িক শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির ( University College ) সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে এল-ই-এ'কে সর্বপ্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তার ফলে ১৯১৩ সালের মধ্যে আরও ২৩টি কলেজ গড়ে ওঠে।

এই সময় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকবৃত্তিতে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের অর্থ-সাহায্য দেওয়ার প্রথাও প্রবতিত করা হল। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র গ্রামারস্কুল থেকেই ছাত্রছাত্রী নেওয়া হত। পরে নতুন প্রবর্তিত মডার্ন স্কুলগুলি থেকেও ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করা হত।

নতুন ছাত্র-শিক্ষক প্রথায় ছাত্ররা স্কুলের পড়া শেষ করার পর কোন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের অধীনে শিক্ষানবীশরূপে থাকত। তারপর ১৮ বৎসর বয়সের সময় তারা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে যোগ দিত। প্রথম প্রথম ছাত্রছাত্রীদের অর্থসাহায্য দেওয়া হত এই সর্তে যে তারা পরে শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করবে, কিন্তু পরে অবশ্য এই সর্ত উঠিয়ে নেওয়া হয়।

সে সময়ের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিতে শিক্ষা-গ্রহণের কাল ছিল তিন মাস এবং শিক্ষার্থীদের সকাল ৬-৩০ থেকে রাত ১০॥০ পর্যন্ত কঠোর কর্মসূচী ও পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হত। তখন মনে করা হত যে শিক্ষকতার কলাকৌশল শেখাটাই সফল শিক্ষক হবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এখন সে ধারণা আমূল বদলে গেছে। বর্তমান শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার (Professional Training) চেয়ে সাধারণ ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী বলে মনে করেন। তার ফলে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিতে শিক্ষাগ্রহণের কাল ধীরে ধীরে বেড়ে বর্তমানে দু'বৎসরে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে যে যে বিষয় পড়ান হত সেগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করা হল। অবশ্য বহুক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে যোগ করা হত ফরাসী ভাষা। বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্গত ছিল শিক্ষাপদ্ধতিতে অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের আয়োজিত আদর্শ পাঠদান বা শিক্ষামূলক প্রদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত অনাবাসিক বা ডে ট্রেনিং কলেজগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ডিগ্রীক্লাস পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেজন্য সেখানে মোট শিক্ষা গ্রহণের কাল হয়ে দাঁড়ায় দুবছরের জায়গায় তিন বছর। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকেই আবাসিক শিক্ষণ কলেজগুলিও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাবার জন্য পরীক্ষার্থী পাঠাতে সুরু করল। এই থেকেই ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংযুক্ত ট্রেনিং কলেজের স্থানে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ (Department of Education) গড়ে উঠল। এই বিভাগের মোট পাঠগ্রহণকাল হল চার বৎসর, তার মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয় শেষ বৎসরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে দুবছরের শিক্ষণ কলেজ ছিল সংখ্যায় ৭৬টি, যেখানে সাধারণ ধর্মী শিক্ষা দেওয়া হত, গৃহ-শিল্পের (house craft) শিক্ষণ কলেজ ছিল ১১টি এবং ২২টি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ। ১৯৪৫

সালে শিক্ষাদপ্তর বেসরকারী শিক্ষণ কলেজগুলিকে তাদের প্রসারণ বা উন্নয়নের মোট ব্যয়ের অর্ধেক দেবার সঙ্কল্প জানালেন। তাছাড়া শিক্ষণ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কলেজ বেতন, বোর্ডিং খরচ প্রভৃতিও শিক্ষাদপ্তর বহন করতে সুরু করলেন। শিক্ষাদপ্তর বেসরকারা কলেজগুলির ক্ষেত্রে যেমন উদার সাহায্য-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তেমন সরকারী অর্থাৎ এল-ই-এ প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিকে সাহায্য করার ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছিলেন। ১৯৪৬ সাল থেকে শিক্ষাদপ্তর শিক্ষণ কলেজ স্থাপন, সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ এবং পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ই বহন করতে সুরু করলেন। শিক্ষাদপ্তরের এই উদার নীতির ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষণ কলেজের সংখ্যাও প্রচুর বেড়ে গেল। ১৯৫৩ সালে সাধারণধর্মী শিক্ষণ কলেজের সংখ্যা দাঁড়াল ১১৪টি, গৃহ-শিল্পের শিক্ষণ কলেজের সংখ্যা ১৪টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের সংখ্যা ২৩টি।

শিক্ষণ কলেজগুলির সম্বন্ধে একটা বড় অভিযোগ ছিল যে এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একরকম সম্পর্কশূন্য অবস্থায় কাজ চালাত। এইজন্য ১৯৩০ সালে শিক্ষাবোর্ড ট্রেনিং কলেজগুলিকে নিজ নিজ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুগ্ম পরীক্ষা বোর্ড ( Joint Examination Board ) গঠন করার নির্দেশ দেন। এই বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষণ কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদেরই পরীক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু এই ধরনের বোর্ড গঠন করা সত্ত্বেও টেনিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দূরত্ব ঘুচল না।

১৯৪৪ সালে স্যার আর্নল্ড ম্যাকনেয়ারের নেতৃত্বে ম্যাকনেয়ার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি দু'টি পরিকল্পনা পেশ করেন। প্রথমটিতে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্কুল-অফ্-এডুকেশন নামে একটি করে প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন এবং স্থানীয় সমস্ত শিক্ষণ কলেজগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে এই স্কুলগুলি কাজ করবে। শিক্ষণ কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা অবশ্য হস্তক্ষেপ করবে না। সাধারণ তত্ত্বাবধান করাই হবে তাদের প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তারা প্রস্তাব করেন যে শিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় প্রতিষ্ঠান একটি করে যুগ্ম পরীক্ষা বোর্ড গঠন করবেন।

স্পষ্টত এ প্রস্তাবটিতে কোন নতুনত্ব নেই এবং এ ব্যবস্থা আগেই প্রচলিত ছিল।

ম্যাকনেয়ার কমিটির কোন্ প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য এ নিয়ে মতান্তর দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষাদপ্তর তৃতীয় একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই পরিকল্পনায় ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ এডুকেশন ( Institute of Education ) নামে নতুন একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গঠন করা হল এবং সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন না করে মন্ত্রীদপ্তরের অধীনস্থ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সালে ১৬টি এই রকম সংস্থা গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে ১৩টিতেই অঞ্চলস্থ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হল অধীনস্থ অঞ্চলের শিক্ষণসূচীগুলির মধ্যে সমন্বয়ন আনা, অধিকতর শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং গবেষণামূলক কার্যে উৎসাহ দান করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হলে শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। তাছাড়া ১৯৪৪ সালের নতুন শিক্ষা আইন পাশ হওয়াতে উপযুক্ত শিক্ষকের চাহিদাও বহু বেড়ে যায়। এই নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করার জন্য সরকার স্যার গিলবার্ট ফ্লেমিংএর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি একটি জরুরী শিক্ষক শিক্ষণ পরিকল্পনা (Emergency Training Scheme) গ্রহণের পরামর্শ দেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২১ থেকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক যে সব নরনারী অন্তত এক বছরও যুদ্ধে বা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট কোন কাজে যোগ দিয়েছে তাদের শিক্ষক শিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হবে। তারা পূর্ণ ১ বৎসর শিক্ষণ পেয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেবে এবং শিক্ষকতা করা কালীন আরও দু'বছর অংশকালীন শিক্ষণ গ্রহণ করবে। এদের শিক্ষণ দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করা হবে।

এই পরিকল্পনাটি শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৫ সালে ৭০০০ প্রার্থী শিক্ষণলাভের জন্য যোগ দেয়। ১৯৪৬ সালের মধ্যে মোট ৩৭,০০০ প্রার্থীর আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়। প্রথম প্রথম এদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কলেজই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রতি বৎসরই নতুন নতুন জরুরী শিক্ষণ-কলেজ স্থাপন করা হচ্ছিল। ১৯৫১ সালের মধ্যে মোট ৫৫টি জরুরী কলেজ স্থাপন করা হয়। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে এই পরিকল্পনাটি বন্ধ

করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বসমেত প্রায় ৩৫,০০০ 'যোগ্যতা সম্পন্ন' শিক্ষক তৈরী করা হয়েছিল।

১৯৪৬ সালে সার্টিফিকেটহীন শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য শিক্ষাদপ্তর থেকে একটি ১ বৎসরের কোর্স খোলা হয়। যে সব শিক্ষকের কম করে ৫ বৎসরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে অথচ কোন সার্টিফিকেট নেই তাঁরা এই কোর্সের সুযোগ লাভ করতে পারেন। এই কোর্সটিও সাময়িক এবং ১৯৫০ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় মোট ১৪৪ জন পুরুষ ও ২,৪৮১ জন নারীশিক্ষক শিক্ষণ লাভ করেছিলেন।

ইংলণ্ডে ১৯৪৪ সালের আইন পাশ হবার আগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই শ্রেণীর স্কুলের জন্য দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হত। মাধ্যমিক স্কুলে দেখা হত শিক্ষক গ্রাজুয়েট কিনা। তিনি শিক্ষণ-প্রাপ্ত (যাকে বলা হত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত or certificated) কিনা সেটা প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল না। অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক গ্রাজুয়েট হয়ে প্রবেশ করতেন পরে শিক্ষণ নিয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতেন। প্রাথমিক স্কুলে কিন্তু নিয়ম ছিল এর বিপরীত। সেখানে শিক্ষক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কিনা সেইটাই ছিল প্রধান দ্রষ্টব্য। শিক্ষকের ডিগ্রী ছিল সেখানে গৌণ।

১৯৩৭ সালে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৬২,১৮১। তার মধ্যে ১৩১,৭৭৫ জনই ছিলেন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত, ২৫,১৬৫ জন ছিলেন সার্টিফিকেট-হীন (uncertificated) এবং ৫,২৪১ জন ছিলেন অতিরিক্ত (supplementary)।

সার্টিফিকেট হীন শিক্ষকেরা শিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও গ্রামার স্কুলের প্রথম স্কুল পরীক্ষাটী পাশ করেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত শিক্ষকদের শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট মান ছিল না।

ঐ সময়েই গ্রামার স্কুলগুলিতে শিক্ষকের মোট সংখ্যা ছিল ২৪,৪৫১। তার মধ্যে ১৯,১০৭ বা ৭৮·১% ই ছিলেন গ্রাজুয়েট। গ্রাজুয়েটদের মধ্যেও আবার শতকরা ৬৩ জনই ছিলেন শিক্ষণপ্রাপ্ত।

কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দ্বিবিধ শিক্ষক-গ্রহণের প্রথা বদলে গেছে। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক উভয়ক্ষেত্রেই

শিক্ষককে প্রথমে যোগ্যতাসম্পন্ন ( qualified ) হতে হবে। তার পর দেখা হবে তাঁর ডিগ্রী আছে কিনা।

যোগ্যতাসম্পন্ন (qualified) শিক্ষক বলতে বোঝায় সেই শিক্ষক যিনি কোন অনুমোদিত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম সন্তোষজনকভাবে শেষ করেছেন বা শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদিত কোন বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী। অনুমোদিত শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম এখন নানাপ্রকারের হতে পারে, যেমন নন-গ্রাজুয়েটদের জন্য কোন ট্রেণিং কলেজের দুবছরের কোর্স, গ্রাজুয়েটদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের এক বছরের কোর্স, জরুরী শিক্ষণ পরিকল্পনায় একবছরের কোর্স, কম করে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অথচ সার্টিফিকেট-হীন শিক্ষকদের শিক্ষণের পরিকল্পনা, শারীরিক শিক্ষার কলেজের কোর্স, ন্যাশানাল ফ্রয়েবেল ইউনিয়নের সার্টিফিকেট দান এবং এই ধরনের অন্যান্য বিশেষধর্মী কোর্স। এর যে কোন একটি পাঠক্রম শেষ করলেই যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক বলে বিবেচিত করা হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ ডিগ্রী থাকলে সেটাকে শিক্ষণের বিকল্প বলে ধরা হয়ে থাকে। তাছাড়া সাময়িক-ভাবে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সার্টিফিকেটহীন শিক্ষকদেরও যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক বলে পরিগণিত করা হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের জন্যই শিক্ষাদপ্তর থেকে এইভাবে শিক্ষণ-হীন বহু শিক্ষককে যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু একথা পরিষ্কারভাবেই শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে কোন শিক্ষককেই যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা হবে না।

### আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণের মাধ্যম ঃ

বর্তমানে ইংলণ্ডে শিক্ষক-শিক্ষণের মাধ্যম বলতে বোঝায় প্রধানত শিক্ষণ কলেজ (Training College) গুলিকে। তারপরই নাম করতে হয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগগুলির। অধিকাংশ শিক্ষক-ছাত্র এ দুটি প্রতিষ্ঠান থেকেই শিক্ষণলাভ করে থাকে।

### শিক্ষণ কলেজ (Training College) ঃ

অধিকাংশ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকই নন-গ্রাজুয়েটদের জন্য নির্দিষ্ট ২-বছরের

শিক্ষণ কোর্স গ্রহণ করে থাকেন। এই কোর্সের শেষে পাওয়া যায় শিক্ষা-দপ্তরের সার্টিফিকেট। ১৯৫৩ সালে এই কোর্সে ভর্তি হয়েছিল এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০,২৩০। এই শিক্ষণ কলেজগুলি দুরকমের হতে পারে, ভলাণ্টারি কিংবা এল-ই-এ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এল-ই-এ প্রতিষ্ঠিত ট্রেণিং কলেজগুলি ভলাণ্টারি কলেজগুলি অপেক্ষা অনেক আধুনিক ও প্রগতিশীল এবং সেগুলিতে ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র পড়া ও শোবার ঘর ছাড়া চিত্ত-বিনোদনের ঘর, খেলার মাঠ, জিম্‌নাসিয়াম, প্রশস্ত ক্লাসঘর, শিল্প-ঘর, গবেষণাগার, সমাবেশ ঘর (Assembly Hall) ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষণ কলেজগুলিতে ভর্তি হতে হলে সাধারণভাবে অন্তত পাঁচটি বিষয়ে জেনারেল সার্টিফিকেট এগজামিনেসন পাশ হওয়া চাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য সবদিক দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হলে এই নির্ধারিত বিদ্যার মান না থাকলেও শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়েও থাকে। সাধারণত শিক্ষণ কলেজে ভর্তি হবার বয়স হল আঠেরো।

বিভিন্ন শিক্ষণ কলেজের পাঠক্রমও বিভিন্ন। তবে সাধারণত কয়েকটি মৌলিক বিষয় সব পাঠক্রমেই থেকে থাকে। যেমন, প্রথমত কোন একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে যতদূর সম্ভব জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই জ্ঞানই হবে তার শিক্ষাবৃত্তির প্রধান পুঁজি। তাছাড়া এই জ্ঞান তার ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা হয়, যাতে সে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারে। তৃতীয়ত, শিক্ষণের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির স্বরূপ এবং কেমন করে সেগুলির সমাধান করতে হয় সে সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই জ্ঞানের তত্ত্বমূলক (theoretical) এবং প্রয়োগমূলক (practical) উভয়দিকই আছে। তত্ত্বমূলক দিকেতে শিক্ষার্থী ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারে, এবং প্রয়োগমূলক দিকটায় শিক্ষার্থী কোন স্কুলে সেই স্কুলের শিক্ষকগণ এবং ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপকগণের সহায়তায় শিক্ষণের অনুশীলন করে থাকেন। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর আগ্রহের প্রসারের জন্য বিশেষ কতকগুলি বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন কোন বিশেষ সৃজনমূলক চারুকলা, বা সমাজসেবা বা কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যা ইত্যাদি।

পূর্বে শিক্ষণ কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশটি কৃত্রিম ছিল। কঠোর অনুশাসন, বারংবার নাম-ডাকা, সতর্ক পাহারায় অবসরযাপন, প্রিফেক্টদের মাতব্বরি ইত্যাদি মিলে শিক্ষণ কলেজগুলির পরিবেশকে অস্বাভাবিক ও অবাস্তব করে তুলেছিল। তার ফলে শিক্ষণ কলেজগুলির মধ্যে যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। কলেজগুলির এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই ম্যাকনেয়ার কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটি এ সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশও দেন।

ম্যাকনেয়ার কমিটির প্রস্তাবের ফলাফল যাই হোক না কেন একথা সত্য যে আগের চেয়ে শিক্ষণ কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ প্রচুর বদলে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজগুলির যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন শিক্ষণ কলেজগুলির মধ্যে ব্যবধানও অনেক হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক শিক্ষণ কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে, অনেক বেশী সমাজধর্মী কাজে তারা ব্যাপৃত থাকে, যুব-সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং অবসর সময়কে অনেক ভালভাবে ব্যয় করার সুবিধা ও সুযোগ পায়।

আবার কোন কোন স্থানে শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ এডুকেশানগুলির কাজ হল বিভিন্ন কলেজগুলির পরীক্ষার মধ্যে সমন্বয় আনা এবং কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া এবং তাদের যোগ্যতাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করা। দেখা গেছে যে শিক্ষকশিক্ষণের পরীক্ষায় ফেলের হার খুব বেশী নয়। ১৯৫৩ সালে ৯,৩৯৩ জন পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে ২৮৫ জন অকৃতকার্য হয়।

ট্রেনিং কলেজের এই দুবছরের কোর্সকে ১৯৬০ সালে তিন বছর ব্যাপী করার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে আরও ১২০০০ শিক্ষার্থীর স্থান হতে পারে সেজন্য শিক্ষণ কলেজেরও সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে।

**বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ** (University Education Department)।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। বর্তমানে এইরকম শিক্ষাবিভাগ আছে ১৭টি এবং প্রতি বছর প্রায় ৩০০০ গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী এই বিভাগগুলি থেকে শিক্ষণলাভ করে বেরোয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের শিক্ষণকালের স্থিতি হল মোট ১ বৎসর এবং কেবলমাত্র গ্রাজুয়েটরাই এই শিক্ষণলাভে অধিকারী। শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন করা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণবিভাগগুলির আরও অনেক কাজ আছে যেমন শিক্ষার উপর নানারূপ গবেষণার আয়োজন করা, শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রীর পাঠস্তর পরিচালনা করা ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগগুলিতে অনুসৃত নিয়মকানুন, পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব এবং ট্রেণিং কলেজগুলির সঙ্গে তাদের সব দিক দিয়েই প্রচুর বৈসাদৃশ্য আছে। তবে ট্রেণিং কলেজগুলির মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগগুলিকেও সেই অঞ্চলস্থ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ এডুকেশানের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হয়। তাছাড়া ট্রেণিং কলেজের মত শিক্ষাবিভাগগুলির ছাত্রছাত্রীদেরও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক বলে ঘোষণা করার জন্য শিক্ষাদপ্তরের নিকট সুপারিশ করার ভার ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ এডুকেশানের উপরই।

সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগগুলিতে কার্যকাল সুরু হয় অক্টোবরে। জুনে ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই পরীক্ষায় যারা পাশ করে তাদের মধ্যে থেকে শিক্ষাবিভাগের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করে নেওয়া হয়। সাধারণত পাঠক্রমে থাকে অধ্যাপকগণের তত্ত্বমূলক বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল ক্লাশ, সেমিনার বা সমবেত আলোচনা, এবং শিক্ষণ অনুশীলন (teaching practice)। অনেক শিক্ষাবিভাগ থেকে শিক্ষার্থীদের স্কুল পরিদর্শন করতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাইরে থেকে প্রখ্যাত অধ্যাপকেরা এসে বক্তৃতা দিয়েও থাকেন।

পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে সাধারণত থেকে থাকে শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব (Principles of Education), মনোবিজ্ঞান (Psychology), শিক্ষার

ইতিহাস এবং বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণী। এর সঙ্গে পড়তে হয় বিভিন্ন বিষয়গুলির শিক্ষণ-পদ্ধতি ( methods )। তাছাড়া ঐচ্ছিক বিষয়ও নিতে হয়। সাধারণত, শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞান ( Educational Sociology ), তুলনামূলক শিক্ষা (Comparative Education), গ্রামীণশিক্ষার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষার্থী বিশেষ একটি বিষয় বেছে নেয়। এই সব তত্ত্বমূলক পাঠগ্রহণ ছাড়া শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অন্তর্নিহিত বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, বিতর্কসভা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদিগকে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়, যাতে তাদের আগ্রহের পরিধি প্রসারিত হয় এবং তাদের সৃজনশক্তি তার বিকাশের উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগগুলিতে টিউটোরিয়াল, মিটিং, এবং সেমিনারের প্রচুর মূল্য দেওয়া হয় এবং এগুলি দিন দিন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে। পুরো পাঠগ্রহণকালের তিনভাগের একভাগ ব্যয়িত হয় শিক্ষণ-অনুশীলনে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ-অনুশীলন করার ব্যবস্থা আছে। কোথাও কোথাও একটানা কয়েকমাস অনুশীলন করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের মধ্যে দুবার একটানা কিছু সময়ের জন্য শিক্ষণ- অনুশীলন করার প্রথা আছে।

পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে আবার কোথাও আধুনিক ধারাবাহিক পরিমাপের ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগে শিক্ষণব্যবস্থাটা গ্রাজুয়েটদের জন্য। কিন্তু শিক্ষণ ছাড়াও বহু গ্রাজুয়েট শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করে থাকেন। এই রকম শিক্ষণহীন গ্রাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা ২৩। এই সংখ্যাটিকে কমিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাবিভাগের প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইংলণ্ডে গ্রাজুয়েটদের কোনরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে গ্রাজুয়েটদের কোন না কোন রূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিতেই হবে। এমন কি সেখানে ডিগ্রী ক্লাসেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা আছে।

**উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠস্তর**

গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ১ বৎসরের এবং নন্-গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ২ বৎসরের শিক্ষণের পাঠস্তর ছাড়াও আরও কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরের প্রচলন আছে। যেমন, শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য এক বৎসরের অতিরিক্ত পাঠস্তর ( Supplementary Course ), ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ এডুকেশনের আয়োজিত ১ বৎসর, ২ বৎসর এবং ৩ বৎসরের শিক্ষণ-কোর্সগুলি, শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত পাঠস্তর এবং এল-ই-এ ও শিক্ষকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনুষ্ঠিত নানা বিভিন্ন প্রকৃতির রিফ্রেসার কোর্স ( Refresher Courses )।

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ গ্রহণ করার পর অনেক শিক্ষক কোন বিশেষ কাজ বা বিষয়ে আরও এক বছর অতিরিক্ত শিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এই অতিরিক্ত শিক্ষণটি প্রার্থমিক শিক্ষণের পর যখন হোক নেওয়া যায়।

১৯৪৭ সালে এঁই অতিরিক্ত শিক্ষণ গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ২২১, ১৯৫১ সালে ৯৭১। আর্থিক কারণে এই শিক্ষণ ব্যবস্থাকে পরে সঙ্কুচিত করতে হয় এবং ১৯৫৩ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪৯। এই শিক্ষণের কোর্স নানা বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। ১৯৫১ সালে শিক্ষার্থীরা মোট ৭৩ রকম কোর্সে শিক্ষণ নিয়েছিল।

ইনষ্টিটিউট অফ্ এডুকেশন থেকেও মেধাবী ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য নানাবিষয়ে শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা পূর্ণকাল যোগ দিতে পারেন তাঁদের জন্য ১ বছরের কোর্স, যাঁরা কিছুটা পূর্ণ সময় কিছুটা অংশ সময় যোগ দেবেন তাঁদের জন্য ২ বছরের কোর্স এবং যাঁরা কেবল অংশ সময় যোগ দেবেন তাঁদের জন্য ৩ বৎসরের কোর্স। শিক্ষকদের কাজ থেকে ছুটি দেবার ব্যাপারে এল-ই-এ'র সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। পূর্ণকালীন শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষাদপ্তর থেকে শিক্ষককে অর্থ সাহায্য করা হয়। এই সব শিক্ষণ নানা বিভিন্ন বিষয়ের উপর দান করা হয়ে থাকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, ধর্মমূলক শিক্ষা প্রভৃতির ডিপ্লোমা, অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ইত্যাদি।

শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষকদের জন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা গত মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থা বন্ধ

হয়ে যায়। ১৯৪৫ সাল থেকে কিছু কিছু করে এ ব্যবস্থাটির পুনর্প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৬ সালে পূর্ণভাবে পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করা হয়। ১৯৪৭ সালে মোট ৭০০০ শিক্ষক ১১৯টি বিভিন্ন কোর্সে এই শিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর পর শিক্ষার্থী সংখ্যা কমতে থাকে এবং ১৯৫৩ সালে ৩,৭১৬ জন এই শিক্ষণে যোগদান করেন। এই কোর্সগুলি প্রধানত পরিদর্শকদের (Inspectors) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পাঠক্রমে শিক্ষক-শিক্ষণের সাধারণ বিষয়গুলিই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

রিফ্রেসার কোর্সগুলি এল-ই-এ এবং শিক্ষকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলি প্রকৃতির দিক দিয়ে যেমন বিভিন্ন, তেমনই সংখ্যাতেও বহু। এই কোর্সগুলিতে সাধারণ বক্তৃতা, আলোচনা, পারস্পরিক চিন্তা-বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলশিক্ষক, কলেজ অধ্যাপক, পরিদর্শকমণ্ডলী, বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইত্যাদি সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠান থেকেই শিক্ষক আনা হয় এই কোর্সগুলি পরিচালনার জন্য।

শিক্ষকদের যোগান ও শিক্ষণের উপর জাতীয় উপদেষ্টা সমিতি (National Advisory Council on the Training and Supply of Teachers) গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে ব্রিষ্টল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য স্যার ফিলিপ মরিসের সভানেতৃত্বে। এই কাউন্সিল ১৯৫১ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেই রিপোর্টে তাঁরা দ্রুতবর্ধমান শিশু সংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের যোগানের অতি-স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের মতে স্কুলগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক রাখতে হলে প্রতিবৎসর ৫,১০০ জন করে অতিরিক্ত শিক্ষক চাই। কাউন্সিলের ১৯৫৩ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে এই অতিরিক্ত শিক্ষকের যোগান পাওয়া বিশেষ অসম্ভব হয় নি। সাম্প্রতিককালে বিবাহিত মেয়েদের বিবাহের শেষে কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসার মনোভাবই এই অতিরিক্ত শিক্ষকের যোগানকে সম্ভব করেছে এবং যদি বর্তমান সময়ের মত বিবাহিত মেয়েদের এই কর্মস্পৃহা ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাকে তবে ভবিষ্যতেও শিক্ষক সরবরাহটা খুব একটা সমস্যা হবে না।

ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সরবরাহের আর একটা বড় সমস্যা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। সেটি হল যথেষ্ট পরিমাণে গণিত এবং বিজ্ঞানের শিক্ষক

পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্বে এই শ্রেণীর শিক্ষকদের খুব অভাব ছিল না। আগে যেখানে বৎসরে গড়ে ১০২০ গণিত এবং বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া যেত এখন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে গড়ে মাত্র ৫৭০ জন। সাম্প্রতিককালে এই অভাবের কারণ হল এই যে শিল্পমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গণিত এবং বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে স্কুলের শিক্ষকতায় তাদের আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাউন্সিলের মত অনুযায়ী স্কুলের শিক্ষকতায় এদের আকৃষ্ট করতে হলে এদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে।

**শিক্ষকদের বেতন**

১৯১৯ সালের আগে শিক্ষকদের বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার বা স্কেল ছিল না। নিয়োগকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ও শিক্ষকের যোগ্যতার বিচার করে বেতন ধার্য করতেন। অবস্থাপন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থাহীন প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে কম বেতন দিত। ডক্টর কার্টিসের একটি বিবরণী থেকে দেখা যায় যে ১৯১৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত সহকারী পুরুষ শিক্ষকদের বার্ষিক বেতন ছিল ১৬৭ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ২৫০৫ টাকা বা মাসিক ২০৯৲ টাকার কাছাকাছি) এবং নারী শিক্ষকদের বার্ষিক বেতন ছিল ১২৩ পাউণ্ড (অর্থাৎ ১৮৪৫৲ টাকা বা মাসিক ১৫৪৲ টাকার কাছাকাছি)।

১৯১৯ সালে বিভিন্ন এল-ই-এ এবং শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে লর্ড বার্নহামের নেতৃত্বে শিক্ষকদের বেতনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বার্নহাম কমিটিই প্রথম শিক্ষকদের বেতনের সুনির্দিষ্ট স্কেল প্রবর্তন করার সুপারিশ করেন। বহু জল্পনা কল্পনা তর্কবিতর্কের পর ১৯২১ সালে এই প্রস্তাবিত স্কেলগুলি গৃহীত হয়।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে পরিষ্কার এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে শিক্ষকদের বেতনের হার নির্ণয় করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী বার্নহাম কমিটির মত কোন কমিটি গঠন করবেন। এই কমিটি শিক্ষকদের বেতনের সুনির্দিষ্ট স্কেল তৈরী করে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তা পেশ করবেন। যদি শিক্ষামন্ত্রী সেই

স্কেল অনুমোদন করেন তবে তিনি এল-ই-এদের সেই স্কেল অনুযায়ী শিক্ষক-বেতন দিতে নির্দেশ দেবেন।

আগে প্রাথমিক শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের স্কেল ছিল পৃথক। বর্তমানে সকল প্রকার শিক্ষকদেরই একটি মূল স্কেল আছে। এই মূল স্কেলের সঙ্গে শিক্ষকের গুণাবলী, যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুযায়ী অতিরিক্ত পারিশ্রমিক যোগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ইংলণ্ডে প্রচলিত এই মূল স্কেলের একটা বিবরণ দেওয়া হল।

যোগ্যতাসম্পন্ন সহকারী পুরুষ শিক্ষকদের বাৎসরিক বেতন ৪৫০ পাঃ ( অর্থাৎ ৬৭৫০৲ টাকা বা মাসিক ৫৬২॥০ টাকা )। এই বেতন প্রতি বৎসর ১৮ পাঃ বা ২৭০৲ টাকা করে বেড়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ ৭২৫ পাউণ্ডে ( অর্থাৎ ১০৮৭৫ বা মাসিক ৯০৬।০ টাকা ) দাঁড়ায়। যোগ্যতাসম্পন্ন সহকারী নারী শিক্ষকদের বেতন হল বছরে ৪০৫ পাউণ্ড ( অর্থাৎ ৬০৭৫ পাঃ বা ৫০৬।০ টাকা মাসে ) এবং প্রতি বৎসরে ১৫ পাউণ্ড বা ২২৫ টাকা করে বেড়ে ৫৮০ পাউণ্ডে ( অর্থাৎ ৮৭০০ টাকা বছরে বা ৭২৫ টাকা মাসে ) দাঁড়ায়। এর পরেও অতিরিক্ত কোন যোগ্যতা, দায়িত্ব বা ট্রেনিংএর জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যেমন দু'বছরের বেশী ট্রেনিং প্রাপ্ত হলে পুরুষ শিক্ষকদের বাৎসরিক ১৮ পাঃ এবং নারী শিক্ষকদের বাৎসরিক ১৫ পাঃ করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকলে পুরুষদের বাৎসরিক ৬০ পাঃ করে এবং মেয়েদের বাৎসরিক ৪৮ পাউণ্ড করে অতিরিক্ত দেওয়া হয়। বিকলাঙ্গ ( handicapped ) ছেলেমেয়েদের পুরুষ শিক্ষকেরা বার্ষিক ৩৬ পাউণ্ড এবং নারী শিক্ষকেরা বার্ষিক ৩০ পাউণ্ড অতিরিক্ত পান। তাছাড়া শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে যদি শিক্ষকতা ছাড়া অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব বহন করতে হয় তবে ৪০ পাউণ্ডের মত অতিরিক্ত একটা বার্ষিক ভাতা দেওয়া হয়।

প্রধান শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষণের সময়, গুণাবলী, অভিজ্ঞতার পরিমাণ ইত্যাদির বিচারে এই মৌলিক স্কেলের উপর অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পান। এই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড থেকে ৯২০ পাউণ্ড পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এবং ৯৫ পাউণ্ড থেকে ৮১০ পাউণ্ড পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে ধার্য হতে পারে।

পরিদর্শক এবং শিক্ষার অন্যান্য পরিচালকদের চেয়ে শিক্ষকদের বেতনের হার মোটের উপর কম।

শিক্ষকদের বেতন ছাড়াও পেন্‌সন প্রথা প্রবর্তিত আছে। শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ১০ ভাগ নিয়ে পেন্‌সনের ফাণ্ড তৈরী করা হয়। এই ১০ ভাগের ৫ ভাগ দেন শিক্ষকেরা নিজে, ৫ ভাগ দেন এল-ই-এ। ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণের সময় হলে এই টাকা এক সঙ্গে বা বার্ষিক ভাতারূপে দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের নিয়োগ ও বরখাস্তেরও সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে। রাজনৈতিক বা ধর্মমূলক কারণে কোন শিক্ষককে বরখাস্ত করা যেতে পারবে না। কোন নারীশিক্ষককে কেবলমাত্র বিবাহের কারণে বরখাস্ত করা চলবে না। যদি কখনও কোন শিক্ষককে বরখাস্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সামনে শিক্ষককে তার বক্তব্য বলতে দিতে হবে। ইংলণ্ডে শিক্ষকেরা একবার নিযুক্ত হলে একরকম স্থায়ী হয়েই যান এবং গুরুতর অপরাধ বা নিতান্ত অশোভন কিছু না করলে বরখাস্ত করা হয় না।

শিক্ষকদের সংগঠন বা সংস্থা একাধিক আছে। সবচেয়ে পুরাতন ও প্রভাবশালী শিক্ষক সংস্থাটির নাম ন্যাশনাল ইউনিউন অফ টিচার্স। এটি ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুলগুলির শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রায় শতকরা ৮০ জন এই সংস্থাটির সদস্য। গ্রামার স্কুলগুলির শিক্ষকদের পৃথক সংস্থা আছে। যেমন হেড্ মাষ্টার্স এ্যাসোসিয়েসান, হেডমিষ্ট্রেসেস্ এ্যাসোসিয়েসান, এ্যাসিস্টাণ্ট মাষ্টার্স এ্যাসোসিয়েসান এবং এ্যাসিষ্টাণ্ট মিষ্ট্রেসেস্ এ্যাসোসিয়েসান। কারিগরী বিদ্যা, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র সংস্থাও অনেক আছে।

## ১৪। ইংলণ্ডে শিক্ষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-পরিদর্শন নানাবিধ কল্যাণকর আয়োজন, ছাত্রবৃত্তি এবং অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপরও নানান আইন পাশ করা হয়েছে। ১৯৪৪'র আইনে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, আহার ও দুধের ব্যবস্থা, বিকলাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

### স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিসের ( School medical service ) বা বিদ্যালয় চিকিৎসার আয়োজন প্রথম সুরু হয়। ১৯০৪ সালে দেশের যুবকদের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ নির্ণয় করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শনের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন কোন স্কুলে চিকিৎসক নিযুক্ত করা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইনে এল-ই-এর হাতে স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ভার দিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষাবোর্ডও একটি চিকিৎসা বিভাগ স্থাপিত করেন এবং একজন চীফ্ মেডিক্যাল অফিসারের হাতে এই বিভাগটি দেওয়া হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ফলে দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চোখ, দাঁত, টনসিল প্রভৃতির রোগের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। সেই থেকে এল-ই-এ স্কুলে স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসার অয়োজন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে যান। ১৯১৩ সালে এর জন্য বিশেষ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ১৯০৮ সালে যেখানে মাত্র ৫৫টি এল-ই-এ স্কুল চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন সেখানে ১৯১৮ সালে ২৮৭টি এল-ই-এ এই চিকিৎসামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল ক্লিনিক ( School Clinic ) বা বিদ্যালয় চিকিৎসাগারের সংখ্যা ৩০ থেকে ৬৯২তে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন কোনও এল-ই-এ ছিল না যার নিজস্ব কোনও ক্লিনিক ছিল না।

১৯২১ সালের আইনে সরকারী প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির এবং যে সব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোন দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সেগুলির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের দায়িত্ব এল-ই-এ-দের দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী এল-ই-এর পরিপোষিত সমস্ত স্কুলেরই—সেগুলি রাষ্ট্রপরিচালিত হোক আর না হোক—ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন এবং চিকিৎসার দায়িত্ব এল-ই-এর হাতে দেওয়া হয়েছে।

তেমনি ১৯২১ সালের আইনে ছেলেমেয়েদের স্কুলের স্বাস্থ্য পরিদর্শনে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া তাদের অভিভাবকদের ইচ্ছাধীন ছিল। অর্থাৎ কোন অভিভাবক ইচ্ছে করলে তাঁর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করতে না দিতেও পারতেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনে প্রত্যেক পিতামাতা তাঁর ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করতে দিতে বাধ্য। তাছাড়া ১৯৪৪-র আইনে যদি কোন ছেলে বা মেয়ের কোন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এল-ই-এর হাতে দেওয়া হয়েছে।

সেইরকম অসুস্থ ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন মত চিকিৎসা করার দায়িত্ব ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এল-ই-এর হাতে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন-বোধ করলে বর্তমানে এল-ই-এ তাদের পরিপোষিত যে কোন স্কুলের যে কোন ছেলেমেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। ১৯২১-র আইন অনুযায়ী এল-ই-এ পিতা মাতার কাছ থেকে চিকিৎসার ব্যয় আদায় করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইন পাশ হবার পর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

১৯৪৪ সালের আইন পাশ হবার পর থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৪৬ সালে এল-ই-এ-র নিযুক্ত মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৩৯৯। ১৯৪৯ সালে এই সংখ্যা হয় ১৮৫৫। তেমনি ১৯৪৬ সালে নিযুক্ত নার্সের সংখ্যা ছিল ৩৭২৬। ১৯৪৯ সালে এই সংখ্যা হয় ৫:৩৪। এই নার্সদের কাজ হল স্কুলে স্কুলে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং বিশেষভাবে স্বাস্থ্য পরিদর্শনের যোগ্য ছেলেমেয়েদের নির্বাচন করা। ১৯৪৬ সালে ন্যাশনাল হেলথ্ এ্যাক্ট ( National Health Act ) পাশ হয়। এই আইনের ফলে এল-ই-এ-রা তাঁদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের

সাহায্য নিতে এবং হাসপাতালে চিকিৎসা করাবার সুবিধা পেলেন। তাঁরা প্রয়োজন বুঝলে আঞ্চলিক হসপিটাল বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলে-মেয়েদের রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতামত পাওয়া এবং হাসপাতালে রেখে তাদের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

## আহার এবং দুধের ব্যবস্থা

১৯০৪ সালে স্বাস্থ্য অবনতির কারণ নির্ণয়ের জন্য যে আন্তর্বিভাগীয় কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল সেই কমিটি ছেলেমেয়েদের দিবাকালীন আহারের ব্যবস্থা করারও সুপারিশ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে যে শিক্ষা আইনটি পাশ হয় সেই আইনে এল-ই-একে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আহারের ব্যবস্থা করার জন্য অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে দেখা গেল যে ১১৩টি এল-ই-এ এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে স্কুলে আহারের আয়োজন সংখ্যায় বেশ বাড়তে থাকে। কিন্তু পরে যুদ্ধ চলা কালীন অনেক জায়গায় অনেক স্কুলে এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে প্রায় অর্ধেকের উপর এল-ই-এ স্কুলে আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪০ সালে স্কুল আহারের খাতে রাষ্ট্রকোষ থেকে বর্ধিত অর্থ সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং যাতে স্কুল ক্যান্টিনগুলিতে অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যায় সেদিকেও মনোযোগ দেওয়া হল। এর ফলে সাধারণভাবে স্কুল আহার ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়। ১৯৪১ সালে যেখানে মাত্র শতকরা ৬'৫ জন শিক্ষার্থী স্কুল আহার গ্রহণ করত সেখানে ১৯৪৪ সালে শতকরা ৩২'৮ জন স্কুল-আহারে যোগদান করত।

প্রথম প্রথম স্কুলে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা একাধিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছিল। ১৯৪৩ সাল থেকে এল-ই-এ এদিকে মনোযোগ দেন। ঐ সালেই স্কুলের ছেলেমেয়েদের অল্পমূল্যে দুধ সরবরাহের জন্য মিল্ক মার্কেটিং বোর্ডকে ( Milk Marketing Board ) অর্থ সাহায্য দেন। দেখা গেল এর ফলে প্রায় অর্ধেকের উপর ছেলেমেয়ে স্কুলে দুধ খেতে সুরু করেছে।

১৯২১ সালের আইন অনুযায়ী স্কুলে দুধ বা আহার সরবরাহ করা এল-ই-এর অধিকারের অন্তর্গত ছিল কিন্তু কর্তব্য ছিল না। তাছাড়া বিশেষ

বিশেষ ক্ষেত্রে স্কুল আহারের খরচা এল-ই-একে ছেলেমেয়েদের পিতামাতার কাছ থেকে আদায় করতে হত। ১৯৪৪ সালের আইনে এই সব বাধা দূর করে দেওয়া হয়। স্কুলে আহার ও দুধ সরবরাহের কাজটা এল-ই-এর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত করা হয়। তাছাড়া এল-ই-এ ইচ্ছামত বিনামূল্যে এই আহার ও দুধ সরবরাহ করতে পারেন। এই আইনে শিক্ষামন্ত্রীকে এল-ই-এর অধীনস্থ স্কুলগুলিতে আহার, দুধ ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন তৈরী করতে বলা হয়। ১৯৪৪ সালে প্রায় ১৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলের ক্যান্টিনে আহার গ্রহণ করেছিল। ১৯৫৩ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭½ লক্ষতে। স্কুল আহার ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের দুধ সরবরাহের ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৪ সালে প্রায় ৩৫ লক্ষ বা মোট স্কুলে যোগদানকারীদের শতকরা ৭৬·৩ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে দুধপান করত। বর্তমানে এই সংখ্যা শতকরা ৮৪ থেকে ৮৫ তে দাঁড়িয়েছে।

**বিশেষধর্মী স্কুল ( Special School ) ও বিশেষ শিক্ষামূলক ব্যবস্থা**

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যে সব শিক্ষার্থী দেহ বা মনের কোনরূপ অক্ষমতা থেকে কষ্ট পায় তাদের জন্য বিশেষধর্মী শিক্ষা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসব শিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে বা অন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এই ধরনের ত্রুটি সম্পন্ন ( handicapped ) ছেলেমেয়েদের ১১ টি শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে যথা, অন্ধ, আংশিক অন্ধ, বধির, আংশিক বধির, ক্ষীণস্বাস্থ্য ( delicate ), ডায়াবেটিস্-রোগযুক্ত, শিক্ষার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ ( educationally subnormal ), এপিলেপ্‌সি রোগগ্রস্ত, অপসঙ্গতি-সম্পন্ন ( maladjusted ), শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন এবং বাচনমূলক ত্রুটিসম্পন্ন (children with speech defects )।

১৯৪৪ সালের আইন পাশ হবার অনেক আগে থেকেই ইংলণ্ডে অসুস্থ বা অক্ষম ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৮৯৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা ( অন্ধ বা বধির ছেলেমেয়ে ) আইনে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিকে অন্ধ ও বধির ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষধর্মী স্কুল স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৮৯৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা ( ত্রুটিসম্পন্ন ও

এপিলেপ্‌টিক ছেলেমেয়ে ) আইনে কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন ও এপিলেপ সি রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৪ সালের আইনে ত্রুটিসম্পন্ন ছেয়েমেয়েদের শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে পৃথক করা হয়নি। সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদেরও তাদের বয়স, সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াটা স্কুলকর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অন্তর্গত করা হয়েছে।

অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ইংলণ্ডে বহুদিন আগে থেকেই করা হয়েছে। ১৭৯০ সালে লিভারপুলে প্রথম অন্ধদের স্কুল খোলা হয়। ১৮৬৯ সালে ওরসেষ্টার কলেজ ( Worcester College ) অন্ধদের জন্য প্রথম মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০৯ সালে অন্ধদের জন্য স্কুল ৩৯টিতে দাঁড়িয়েছিল, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬০০। ১৯৫০ সালে আংশিক ও পূর্ণ অন্ধদের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪তে এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয়েছিল ২৫০০। ইতি-পূর্বে কেবলমাত্র পূর্ণ অন্ধদেরই অন্ধ বলে ধরা হত কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনে যারা আংশিক অন্ধ বা ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হল। প্রথম প্রথম পূর্ণ অন্ধ ও আংশিক অন্ধদের একই বোর্ডিংএ রাখার প্রথা ছিল কিন্তু ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ সালে আংশিক অন্ধদের জন্য পৃথক বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছে।

বধির ছাত্রছাত্রীদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থাও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই চলে আসছে। একটি সাম্প্রতিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে বধির এবং আংশিক বধিরদের জন্য বর্তমানে স্কুল আছে ৪৫টি এবং সেগুলিতে শিক্ষালাভ করে ৪৯০৫ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষাদপ্তরের হিসাবে সমস্ত দেশে ৮৫০০ থেকে ১০০০০র মত ছেলেমেয়ে হয় বধির নয় আংশিক বধির। অতএব তাদের জন্য এই ধরনের স্কুলের আরও প্রসার করা দরকার।

শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন এবং দুর্বল স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯৪৪ সালে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য শারীরিক ত্রুটি থাকলেই যে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তা নয়। অনেক অঙ্গহীন ছেলেমেয়ে সাধারণ স্কুলেও যোগ দিতে পারে। কিন্তু যে সব বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন ছেলেমেয়ের পক্ষে সাধারণ স্কুলে যোগ দেওয়া সম্ভব

নয় তাদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। দুর্বল স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলতে বোঝায় সেই সব ছেলেমেয়ে যারা রক্তহীনতা, স্নায়ুদৌর্বল্য, হাপানি ইত্যাদি রোগে জন্ম থেকেই ভোগে।

১৯৪৬ সালের শিক্ষাদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ও দুর্বলস্বাস্থ্যসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৭৫,০০০ থেকে ১৪০,০০০র মত হবে। অথচ বিশেষধর্মী স্কুলে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়ে পড়ে মোট ১৭,৪৪১ এবং বলা বাহুল্য এদের জন্যও স্কুলের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে হবে।

সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে যে সব ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ তাদের জন্য বিশেষধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ বলতে নানা বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েকে বোঝায়। একদিকে যেমন যে সব ছেলেমেয়েদের স্কুলের পাঠে সামান্য সাহায্য করলেই চলতে পারে তাদেরও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ বলা হয় তেমনই আবার অপরদিকে কোন বিশেষ ধরনের স্কুলে রেখে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও সামান্যই শেখান যায় এমন ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ বলা হয়ে থাকে। অতএব বলা বাহুল্য যে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাদের যথার্থ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়।

এই শ্রেণীর ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য ১৮৯০ সালে লিসেষ্টার এবং লণ্ডনে প্রথম স্কুল খোলা হয়। ১৯০৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন এল-ই-এ কর্তৃক প্রায় ৪০টি এই শ্রেণীর বিশেষধর্মী স্কুল স্থাপিত হয়। বর্তমানে ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বহু স্কুল স্থাপিত হলেও দেশের পূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। ১৯৫০ সালে ১৫,৫৯১ জন শিক্ষায় পশ্চাৎপদ বিশেষধর্মী স্কুলে শিক্ষা-লাভ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ১২ হাজারের উপর ছেলেমেয়ে স্কুলে স্থানলাভের জন্য অপেক্ষা করেছে।

এপিলেপ্‌সি রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৯০৩ সালে। ১৯১০ সালে প্রথম এল-ই-এ'র স্কুল স্থাপিত হয় ম্যানচেষ্টারে। সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে ৭৯৪ জন এপিলেপ্‌টিক্ বিশেষধর্মী স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছে।

ডায়াবিটিস্ রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা ১৯৪৪ সালের আইনের পর থেকে হয়েছে। এদের সংখ্যা অবশ্য অল্প।

অপসঙ্গতিসম্পন্ন ( maladjusted ) ছেলেমেয়েদের জন্য শিশু পরিচালন ( Child guidance ) আন্দোলন ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুরু হয়। শিক্ষাবোর্ডের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর ক্রাউলি ( Dr Crowly ) আমেরিকা পরিদর্শন করেন সেখানকার শিশু-পরিচালনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য। ফলে ১৯২৬ সালে ইষ্ট লণ্ডন ক্লিনিক ( East London Clinic ) খোলা হয়। পরের বছর শিশু-পরিচালন সমিতি (Child Guidance Council ) স্থাপিত হয়। যুদ্ধের সময় এই আন্দোলন কিছু মাত্রায় মন্থর হয়ে গেলেও যুদ্ধের পর আবার সত্বর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় স্থানান্তরকরণ ও অন্যান্য কারণে এই ধরনের অপসঙ্গতিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ শিশু-পরিচালনার আরও প্রসারের প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোট শিশু-পরিচালনার চিকিৎসাগারের ( Child Guidance Clinic ) সংখ্যা হয় ৭৯টি। ১৯৫৩ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় যে বিশেষধর্মী স্কুলে শিক্ষালাভ করছে এমন অপসঙ্গতিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৮১৪টি।

বাক্‌ঘটিত ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদেরও নানা শ্রেণীতে ফেলা যায়। যেমন তোৎলামি, কণ্ঠস্বরের ত্রুটি, উচ্চারণের ত্রুটি, বাক্‌রোধ ( aphasia ) প্রভৃতি নানা প্রকারের অসুস্থতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা এই শ্রেণীতে পড়ে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে বাক্‌ঘটিত ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা ও বিশেষধর্মী শিক্ষা দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পিচ থেরাপি ( Speech therapy ) বা বাক্‌দোষের চিকিৎসার সুযোগ যাতে এই শ্রেণীর সব ছেলেমেয়ে পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে সমস্ত দেশে বাক্‌দোষসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৭৫ হাজার থেকে দেড় লক্ষের মধ্যে। ১৯৫০ সালে প্রায় ২৫০ জন পূর্ণকালীন বাক্‌দোষের চিকিৎসক ( Speech therapist ) নিযুক্ত করা হয়েছিল।

### ছাত্রবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থসাহায্য

ইতিপূর্বে যখন ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না তখন যাতে

দরিদ্র অভিভাবকদের মেধাবী ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতে পারে তার জন্য সরকার থেকে নানারূপ ছাত্রবৃত্তি ও অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক স্কুলেই কিছু সংখ্যক আসন অবৈতনিক রাখাও বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৪৪ সালের আইনে সমস্ত স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষাকেই অবৈতনিক বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা অর্থসাহায্যের কোন প্রশ্নই আর থাকে না।

যে সব ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক হয় তাদের জন্য বৃত্তি বা অর্থসাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন আগে থেকেই অনুভূত হয়েছে। ১৮৫২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে রাজকীয় কমিশনটি নিযুক্ত হয়েছিল সেই কমিশনটিতে বলা হয় যে মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক ছেলে অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে না। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নির্দিষ্ট স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী নিত। কিন্তু এই কমিশনের নির্দেশের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে যে কোন স্কুল থেকেই ছাত্রছাত্রী নেবার নিয়ম হল এবং ব্যাপকভাবে ছাত্রবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হল।

প্রথম প্রথম এল-ই-এ থেকেই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। ১৯১১ সাল থেকে শিক্ষাবোর্ড থেকেও সরাসরি বৃত্তি দেওয়া সুরু হল। ১৯২০ সালে শিক্ষাবোর্ড থেকে ষ্টেট্ স্কলারশিপ (State scholarship) বা রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হল। প্রথম প্রথম এই বৃত্তির সংখ্যা ছিল ২০০, ১৯৩০ সালে হল ৩০০ এবং ১৯৩৬ সালে ৩৬০। এল-ই-এর দেওয়া বৃত্তির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৯৩৬ সালে ৫০০০এ গিয়ে ওঠে।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন পাশের পর ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি দানের ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৬ সালে যে সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পুরস্কার বা বৃত্তি পায় তাদের অতিরিক্ত অর্থসাহায্য দেবার প্রথা প্রবর্তিত করেন।

১৯৪৭ সালে শিক্ষাদপ্তর কারিগরি শিক্ষার জন্য ১০০টি রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেন। এর ফলে মোট রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা ১৯৪৯ সালে দাঁড়ায় ৭৯৩তে এবং ১৯৫০ সালে ৯২৯এ।

যে সব ছেলেমেয়েরা যুদ্ধে যোগদান করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষাদপ্তর অন্যান্য সরকারী দপ্তরের সহযোগিতায় ১৯৪৩ সালে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ-প্রত্যাবৃত্ত নরনারীদের পুনঃ শিক্ষার জন্য ১৯৪৯ সালে প্রায় ৮৩,০০০ ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি ও অর্থসাহায্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, সব চেয়ে ভাল ছাত্রছাত্রী যারা প্রথম শ্রেণী বা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাবার যোগ্য এবং দ্বিতীয় দলে হল সেই সব ছাত্রছাত্রী যারা তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের যোগ্য। এই স্থির হল যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তি পাবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীদের অর্থসাহায্য করবে এল-ই-এ। এই নতুন নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তি যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়ে যায়। ১৯৫৩ সালে মোট রাষ্ট্রীয় বৃত্তি দেওয়া হয়েছে ১৭৭৯টি এবং অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে ১১৭২টি। এল-ই-এ কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং ১৯৫৩ সালে মোট ৯,৯২৮টি ছাত্রবৃত্তি বিভিন্ন এল-ই-এ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে।

## ১৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

সমগ্র ইংলণ্ডে মোট ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (University College) আছে। এগুলির বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়। এগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বৈশাদৃশ্য এবং বৈচিত্র্য এত বেশী যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির প্রত্যেকটিই স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করে থাকে। নিজের নিজের কর্মচারী নির্বাচনে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই স্বাধীন। ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারও সম্পূর্ণ নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে যাতে প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীই জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে লেখা পড়া শিখে উপকৃত হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সকল প্রকার বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। এগুলি নিজেরাই নিজেদের পাঠক্রম নির্ধারণ করে; গবেষণার বিষয় স্থির করে, পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং ডিগ্রী দান করে এবং সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত বার্ষিক অর্থ সাহায্য নিজেদের পছন্দ মত ব্যয় করে থাকে। এদের মধ্যে যে যে বিষয়ে পার্থক্য সেগুলি হল বয়স এবং ঐতিহ্য, জন্ম, আয়তন, পরিচালন এবং সংগঠনের ব্যবস্থা, শিক্ষার পরিধি, পাঠসূচী এবং শিক্ষণ পদ্ধতি, গবেষণার উন্নতি, ছাত্রজীবনের ধারা এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ।

এটা ভাবা ভুল হবে না যে এই ধরনের স্বায়ত্ত শাসন এবং স্বাধীনতা থেকে জন্ম নেয় অরাজকতা, মাণের বৈষম্য, নীতির অভাব এবং জনসমাজের প্রয়োজনের প্রতি অবহেলা। কিন্তু এগুলির মধ্যে এমন একটা উদ্দেশ্যের অভিন্নতা এবং অন্যান্য ঐক্যমূলক প্রভাব আছে যার ফলে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার ভার এতগুলি স্বাধীন এবং বিভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

এই ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে তাদের সৃষ্টির সময়ানুক্রমে সাতটি বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়।

১। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

২। স্কটিস্ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।

৩। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়েলসের বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সঙ্ঘবদ্ধ ( federal ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এই বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ৩৯, ২ এবং ৫টি বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত।

৪। ৮টি বড় নাগরিক ( Civic ) বিশ্ববিদ্যালয়—ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, লিভারপুল, লীডস্, শেফিল্ড, বেলফাষ্ট, ব্রিষ্টল এবং নটিংহাম।

৫। ৫টি ছোট নাগরিক ( Civic ) বিশ্ববিদ্যালয়—রিডিং, সাদাম্পটন, হাল, এক্সেটার এবং লিস্টার।

৬। ম্যানচেষ্টার কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি এবং গ্লাসগোর রয়েল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি। এ কলেজ দুটির ছাত্রদের যথাক্রমে ম্যানচেষ্টার এবং গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে।

৭। নর্থ ষ্টাফোর্ডসায়ারের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ( University College )। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আকৃতির বিরাট বৈষম্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন নর্থষ্টাফোর্ডসায়ারের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬৮৯ ; আবার লণ্ডনের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২১,০০০ জনেরও অধিক। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিয়ে এবং ডারহাম ও ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে ধরে সংখ্যা হিসাব করলে দেখা যায় যে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কোথাও ৬ হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী ছিল না। এর মধ্যে আবার ১৫টিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,০০০এরও কম। অন্যান্য দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আয়তনে ছোট। পঠিত বিষয়গুলির হিসাব করলে দেখা যায় যে কারিগরী এবং বিজ্ঞানের দুটি কলেজ ব্যতীত অন্যান্য সবগুলিতে কলা এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কারিগরী ও বিজ্ঞানের কলেজ দুটিতে কোন কলা-ঘটিত বিষয়ই পড়ান হয় না। ২০টি প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, ১৬টিতে চিকিৎসা বিদ্যার স্কুল রয়েছে, ১২টিতে রয়েছে দন্ত সম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ; ১৩টিতে আছে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা, ৭টিতে আছে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ৩টিতে আছে অরণ্য-বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা।

যুদ্ধের পূর্বে যেখানে পূর্ণ সময় শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ বর্তমানে সে সংখ্যা হয়েছে ১০০,০০০ এবং এদের এক চতুর্থাংশ হল মেয়ে। ১৯২০-৩০ সালে জন্ম হার কমে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। এর কারণ হল বর্তমানে স্কুলে ১৭ বা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত লেখা পড়া করে এমন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

১৯৩৯ সালে ব্রিটেনে ১৭ বা ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতি ৬০ জনের মধ্যে মাত্র এক জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত পৌছত। বর্তমানে সেই সংখ্যা প্রতি ৩০ জনে একজন হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর এই সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা সম্পন্ন এমন ছেলে মেয়েদের জন্য অর্থ সাহায্য এবং পুরস্কারের পরিমাণের প্রচুর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এইভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন থেকে বেড়ে শতকরা ৭৫ জনেরও বেশী হয়েছে।

সর্বশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালের দৈর্ঘ্যের গড় ধীরে ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবে বেড়ে চলেছে। প্রথম ডিগ্রীর অধ্যয়নকালের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি এর কারণ নয়। প্রথম ডিগ্রী বল্‌তে বোঝায় তিন বৎসর বা কখনও চার বৎসর ব্যাপী পাশ ডিগ্রীকোর্স বা অনার্স ডিগ্রীকোর্স। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াই এর প্রধান কারণ। যুদ্ধের পূর্বে যেখানে ছিল শতকরা ৬ জন সেখানে বর্তমানে ১৫ জন ছাত্র পূর্ণ সময়ের জন্য উন্নত ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য কাজ করছে। এই প্রবণতা বেড়েই চলেছে এবং বর্তমানে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট গবেষণার পরিবর্তে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষামূলক কোর্স গ্রহণ করছে।

যুদ্ধের পূর্বে শতকরা ৫৩ জন কলাবিদ্যায় প্রথম ডিগ্রী লাভ করত। কিন্তু বর্তমানে এই হার কমে শতকরা ৪৭ জন হয়েছে। অবশিষ্টসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র সংখ্যাগত বৃদ্ধিই হয়নি, বিজ্ঞান শিক্ষার যে মানগত উন্নতি হয়েছে তারও প্রচুর প্রমাণ আছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমানে বাড়ীতে থেকে পড়ার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার অধিকতর ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গত ৭ বৎসরে শতকরা ৫১ জন থেকে কমে শতকরা ২২ জন হয়েছে। শতকরা ৪৮ জন ভাড়া বাড়ীতে এব শতকরা ৩০ জন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের হষ্টেলে বাস করছে। ছাত্রছাত্রী-দের যুদ্ধোত্তর সামাজিক এবং ভৌগলিক পরিবর্তনের ফলে কেবলমাত্র তাদের নিজেদেরই পরিবেশের সঙ্গে সংগতি-বিধান করার সমস্যাই দেখা দেয়নি অধিকন্তু অতীতে শিক্ষা সংক্রান্ত এবং ছাত্রজীবন সংগঠন সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সে সবেরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সংখ্যার অনুপাত ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ১ : ১০'২ এবং বর্তমানে ১ : ৭'৪ হয়েছে। এই উন্নতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আরও অধিকসংখ্যক পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রী নিতে পারছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গবেষণার পেছনে আরও অধিক সময় দিতে পারছেন এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই গতানুগতিক বক্তৃতাদানের পরিবর্তে সেমিনার, সঙ্ঘবদ্ধভাবে আলাপ আলোচনা এমন কি ব্যক্তিগত শিক্ষণ ও সাহায্যদানের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ককে নিকটতর করে তোলা হয়েছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ডের উপরে ছিল এবং এর প্রায় অর্ধেক ব্যয় করা হত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতনের পেছনে। এই আয়ের শতকরা ১১ ভাগ আসত ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে, শতকরা ৬ ভাগ গবেষণার অন্য অর্থ সাহায্য থেকে, শতকরা ৩ ভাগ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে এবং শতকরা ১০ ভাগ জনসাধারণের দান থেকে। বাকী শতকরা ৭০ ভাগ ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্ কমিটির ( University Grants Committee ) মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে পাওয়া। এই সাহায্য বৎসরান্তে এক সঙ্গে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি ৫ বৎসরের জন্য সরকারী নীতি জানিয়ে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই এই অর্থের কোন একটি অংশ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সে অর্থের পরিমাণ নিতান্ত অল্পই হয়ে থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ২,০০০,০০০ পাউণ্ড

বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট আয় হয়েছিল ৩৫,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ।

**বর্ধিত রাষ্ট্র সাহায্য**

যুদ্ধের আগে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়দিগকে মূলধনমূলক খরচার খাতে কোনরূপ সাহায্য করত না। কিন্তু বর্তমানে মূলধনমূলক খরচার শতকরা ৯০ ভাগই রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬—এই দশ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাড়ী, জমির বেতন এবং নতুন বিভাগের সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যয়ের খাতে রাষ্ট্রের বাৎসরিক সাহায্য প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালে এই সাহায্য ১৪০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়ে উঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারের পরবর্তী কয়েক বৎসরের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানে সক্ষম ছেলেমেয়েদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন ছেলেমেয়েদের ১৭ কিংবা ১৮ বৎসর পর্যন্ত স্কুলে থাকার প্রবণতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল তেমনি অপর দিকে যুদ্ধের শেষ কয় বৎসরে এবং ঠিক যুদ্ধোত্তর কালে জন্ম হার আকস্মিক ভাবে প্রচুর বেড়ে যাওয়াতে ১৯৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ প্রার্থীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যাবে এবং ১৯৬৬-৬৯ সালে এই সংখ্যার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ঠেকবে। ১৯৬০ সালের শেষে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৩৬,০০০ দাঁড়াবে এই ধরে নিয়ে বর্তমান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এই বর্ধিত সংখ্যার ⅔ অংশ ছাত্র বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই বৃদ্ধির কথা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে স্থান দিতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য সম্প্রতি সরকার অর্থ সাহায্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ এই দশ বৎসরে বাড়ীর জন্য গড়ে বাৎসরিক সাহায্যের হার ছিল ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে বাৎসরিক ১০২ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৬০-১৯৬৩ এই চার বৎসরে এই বাৎসরিক সাহায্য ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। বাড়ী তৈরির পরিকল্পনা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হয়েছে এবং নতুন বাড়ীর প্ল্যানও আগেই তৈরী হয়ে গেছে।

পূর্বে যদিও বলা হয়েছে যে এই ২৫টি প্রতিষ্ঠানই প্রচুর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে তবুও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি উন্নত মানের সমন্বয় এবং বেশ সুনির্দিষ্ট নীতি দেখতে পাওয়া যায়। এই সমন্বয়ের দুটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অধিকাংশ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে উন্নত হয়েছিল। এই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার জন্য এবং সেখানকার ডিগ্রী পাবার জন্যই এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরিশ্রম করত এবং তার ফলেই সর্বত্রই একটা সাধারণ মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত শিক্ষামূলক মান বজায় রাখা ছাড়াও এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যমূলক সমতা ছিল। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অধ্যক্ষদের সম্মিলিত সংগঠনের উল্লেখ করা যায়। এই সংগঠনটি প্রতি মাসে সাধারণ বিষয়বস্তু-গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়ে থাকে। যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি নিছক একটি পরামর্শদানকারী সংগঠন এবং এর কোনরূপ কার্য্যনির্বাহের ক্ষমতা নেই তবুও এর ঐক্যমূলক প্রভাব অসীম।

## ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্ কমিটি

ব্রিটেনের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ( Chancellor of Exchaquer ) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সংগঠনটির উপদেশমূলক ও কার্য-নির্বাহমূলক উভয় প্রকারেরই ক্ষমতা আছে।

এই কমিটির কর্তব্যের অন্তর্গত হল—

১। ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তার অনুসন্ধান করা।

২। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ সাহায্যকে কিভাবে ব্যয় করতে হবে সে সম্বন্ধে সরকারকে উপদেশ দেওয়া।

৩। সমগ্র ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে খবরাখবর সংগ্রহ করা, সেগুলি পরীক্ষা এবং সরবরাহ করা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে জাতীয় প্রয়োজনীয়তার পূর্ণ উপযোগী হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সেগুলির উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে নানারূপ পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করা।

**গুরু দায়িত্ব** ( Heavy Responsibility )

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে সরকারী পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সেগুলিকে কার্যকরী করার ব্যাপারে এই কমিটির দায়িত্ব অসীম। দেশের কোন জাতীয় প্রয়োজন অনুভূত হলে এবং তাকে স্বীকার করে নেওয়া হলে তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে আলোচনা করে সেটিকে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করা কমিটির কর্তব্য। বিনা দ্বিধায় এটা বলা চলে যে যুদ্ধের সময় থেকে রাষ্ট্রের বহু দাবী বিশ্ববিদ্যালয় পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে এসেছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ এবং মূলধনমূলক সমস্ত খরচই সরকার বহন করে থাকে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এত স্বাধীনতা দেওয়া সত্যই বিপজ্জনকও। কিন্তু স্বাধীন সমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বাধীন থাকবে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট এই রীতিই অনুসরণ করে এসেছে এবং অন্যান্য যেসব দেশে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ব্যয় বহন করে সে সব দেশের তুলনায় ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। গত ৪০ বৎসরের উপর এই ভাবে সরকারী সাহায্য দানের প্রথা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই চলে আসছে। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার জেমস্ ডাফ্ (Sir James Duff) ব্রিটিশ কাউন্সিলের জন্য লিখিত তাঁর এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বলেছেন—

"সমস্ত ব্যবস্থাটাই একটা পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করেন যে তাঁদের দেওয়া অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় মিতব্যয়িতার সঙ্গে খরচ করবে। সরকার অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অডিট করা হিসাব দেখেন কিন্তু তার মধ্যে যেটুকু ভুল হবার তার আগেই হয়ে গিয়ে থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্ কমিটির বিচারের উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অগাধ বিশ্বাস আছে এবং কমিটিকে তাদের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষক হিসাবে তারা মনে করে।

**বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা**

অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন

১। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাটা প্রতিযোগিতামূলক। কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট মান পর্য্যন্ত পৌছলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের সংখ্যা বেশ কম। ফলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই বহুসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী বেছে নিতে পারে। এই জন্যই স্কুলে যে সব ১১ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার জন্য তৈরী করা হচ্ছে তাদের আগেই প্রশ্ন করা হয় যে ভবিষ্যতে তারা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে চায় কিনা এবং যারা তা করবে তাদের তখন থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষভাবে তৈরী করা হয়।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সময় খুবই কম। এর আয়ুষ্কাল মাত্র তিন বৎসর। এত অল্প সময়ের জন্য শিক্ষাদান চলতে পারার কারণ হল যে ইংলণ্ডের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অতি উচ্চ মানের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী তিন বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বিশেষজ্ঞ করে তোলার জন্য চেষ্টা করা হয়। অক্সফোর্ডে কেবলমাত্র রসায়ন বিদ্যার চার বৎসরের কোর্স প্রচলিত আছে।

৩। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যা উভয় শাখাতেই প্রচুর সংখ্যার ছাত্রছাত্রীরা পড়ে। এই দুটি শাখার মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাগ করা হয়েছে এবং সাধারণতঃ দুই বিভিন্ন শিক্ষকগোষ্ঠী এই দুটি শাখায় অধ্যাপনা করে থাকেন।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিভাগগুলিতে গবেষণামূলক কাজ করার ইচ্ছা বেশ প্রবল। বিজ্ঞান জগতে যাঁদের মহৎ অবদান রয়েছে এবং যাঁদের পথ অনুসরণ করে ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে যেতে পারবে এমন সব ব্যক্তিরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগগুলি পরিচালনা করে থাকেন। যে সমস্ত ছাত্রেরা প্রথম ডিগ্রীলাভ করে তাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগে গবেষণা করার জন্য থেকে যায় এবং তিন বা তিনের অধিক বৎসর সেখানে কাজ করে পি-এইচ্-ডি ডিগ্রী পায়। অনেকে আবার আরও দীর্ঘ দিন গবেষণা করে থাকেন।

শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা দেশের আশু প্রয়োজন মিটাতে পারবে এমন সব লোকদের যন্ত্র বিদ্যাবিভাগে ( Engineering Department ) শিক্ষা

দেওয়া হয়। শিল্প বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ এদের শিক্ষকতার কাজ করে থাকেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ পি-এইচ্-ডি'র জন্য চেষ্টা করলেও অধিকাংশই শিক্ষা শেষে কোন না কোন শিল্পে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশুনা করেন। ভবিষ্যতে যে ধরনের কাজ এরা করবে সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যারা যন্ত্র বা শিল্পঘটিত মৌলিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন তাদের সাথে এদের সম্পর্ক খুব কম। বর্তমানে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নতুন শিল্পতত্ত্ব যেখানে দ্রুত প্রসার লাভ করছে সেখানে এইসব শিল্প জগতের বৈজ্ঞানিক অধিনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের জন্য কয়েক মাস আগে কেম্ব্রিজে চার্চিল কলেজ ( Churchill College ) স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজটি বিজ্ঞান এবং শিল্পতত্ত্বের উন্নতির জন্যই বিশেষভাবে সৃষ্ট। বিভিন্ন শিল্প এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদারতায় এই কলেজটির স্থাপনা সম্ভবপর হয়েছে। শিক্ষাবিদ্‌গণ আশা করেন যে বিজ্ঞান ও শিল্পঘটিত যে সব গুরুতর সমস্যা অসমাধিত রয়েছে সেগুলি এই কলেজের শিক্ষার্থীরা সমাধান করতে সমর্থ হবেন।

---

এই পরিচ্ছেদটি ইংলণ্ডের ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্স্ কমিটির চেয়ারম্যান স্যার কীথ্ মুরে এবং কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এন্. এফ্. মট কর্তৃক কমনওয়েলথ এডুকেশন কনফারেন্স ( ১৯৫৯ ) উপলক্ষ্যে লিখিত দুটি প্রবন্ধের অনুসরণে লিখিত।